হুমায়ূন আহমেদ ও একজন মৃত মানুষের গল্প

আবুল বাসার

এটা নতুন একটা গল্প। অন্য সব গল্প থেকে একটু আলাদা, অন্য রকম। প্রেম ও নারী সম্পর্কে যে রকম গল্প আছে, এই গল্পটা সে রকম নয়। সিনেমার ঘটনাবহুল কোন আবেকঘন কাহিনীও নয়, যে দৃশ্য দেখে দর্শক চোখের জল ফেলে। কিংবা উপন্যাস নাটকের কল্পনায় যে কাহিনী তৈরি হয়, এই গল্পটা সে রকমও নয়। এই গল্পটা একজন স্বপ্নবাজ যুবককে নিয়ে, যে কিনা মরে গিয়েও পৃথিবীতে বেঁচে ছিল...।

গল্প শেষে আমরা একসঙ্গে বলে উঠলাম, 'অদ্ভুত ঘটনা!'

হুমায়ূন আহমেদ বললেন, 'হ্যাঁ, অদ্ভুত! এই ঘটনার মধ্যে তিনটি বিশেষত্ব আছে। প্রথমটা হলো, জাহিদ মরে গিয়ে আবার বেঁচে উঠল কীভাবে এবং রাতে সে বিড়ালের রূপধারণ করত কেন? জানি, বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি এটার কোন জবাব দিতে পারবে না। দ্বিতীয়টা হলো, জাহিদের পুরো জীবনটাই কেমন ঘটনাময়, তাই না?'

নূরজাহান জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, ঘটনার তৃতীয় বিশেষত্বটা কী?'

তৃতীয় বিশেষত্বটাই হলো এই গল্পের মূল রহস্য। পাঠক! নিজ দায়িত্বে এই রহস্য উদ্ঘাটন করুন।

প্রচ্ছদ :: রাজু আহমেদ

হুমায়ূন আহমেদ ও একজন মৃত মানুষের গল্প

আবুল বাসার

হুমায়ুন আহমেদ ও একজন মৃত মানুষের গল্প

আবুল বাসার

গ্রন্থ স্বত্ব

খাদিজা নূরজাহান

প্রকাশক

শব্দশিল্প

প্রকাশকাল

ফেব্রুয়ারি- ২০১৩

প্রচ্ছদ

রাজু আহমেদ

কম্পিউটার কম্পোজ

দীপ্তি কম্পিউটার্স

মুদ্রণ

রাজধানী অফসেট প্রিন্টার্স
পাটুয়াটুলি, ঢাকা

মূল্য : ১২০.০০ টাকা মাত্র।

ISBN-987-70323-0182-5

Humayun Ahmed O Akjan Miritomanusar Galpo written By Abul Bashar , Published by, Sabdashilpo, First Edition February, 2013, Cover Designer Raju Ahmed, Compose Dipti Computer, Printing Rajdhani Offset Printers, **Prise Tk. 120.00 Only,** ISBN-987-70323-0182-5

"একটা মানুষ কত ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে আসে, বাঁচে মাত্র ৭০-৮০ বছর। অথচ একটা কচ্ছপ বাঁচে সাড়ে ৩০০ বছর।" - হুমায়ূন আহমেদ

উৎসর্গ

আমার মা ও বাবা

এবং

মায়ের মতো আদর ও স্নেহ দিয়েছেন যিনি, তাঁকে।

যে কথা বলতেই হবে

এ উপন্যাসটি গ্রন্থরূপ দিতে আমার বছর পাঁচেক সময় লেগেছে। অবশ্য লিখতে অতটা সময় লাগেনি। আখ্যানপর্ব নির্মাণ ও প্রকাশক সঙ্কটে লেগেছে সময়টা। নতুন লেখকের বেলায় যা ঘটে। এ গল্পের শুরুতেই আছেন নন্দিত লেখক, চলচ্চিত্র ও নাট্যপরিচালক হুমায়ূন আহমেদ। শুধু এ কারণেই একসময়ে বিমুখ হওয়া প্রকাশকগণও বিমুগ্ধ হয়ে বেশ আগ্রহী হয়েছেন বই ছাপতে। তখন হুমায়ূন আহমেদ জীবিত ছিলেন, ক্যানসার আক্রান্তও হননি। খুব ইচ্ছে ছিল, এই নামের ও এই ধরনের বইটি তাঁর হাতে দিয়ে, আমাকে তিনি কী বলেন তা শোনার।

গল্পটা প্রচলিত ধারায় লেখা হয়নি। মনে হবে, প্রচলিত উপন্যাসের আঙ্গিক নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছি। গল্প এগিয়ে গেছে গল্পের ঢঙে, স্মৃতিচারণ ও ব্যক্তিগত রচনার ঢঙে। এমন নয় যে, গল্পের টান ও শব্দ চয়নে মোহাবিষ্ট হয়ে পাঠক পাতার পর পাতা এগিয়ে যাবেন। তবে এ ধারার উপন্যাসের সঙ্গে আমাদের পাঠক খুব বেশি পরিচিত নন, তারা একটি উপন্যাসে মূলত একটি গল্প প্রত্যাশা করেন ঔপন্যাসিকের কাছে । কিন্তু এই উপন্যাসের গল্পের ভেতরে গল্প, তার ভেতরে আরেকটা গল্প, এবং আরেকটা গল্প ভাঁজ করে রাখা। পাঠককে সেই ভাঁজ খুলে খুলে পড়তে হবে।

আবুল বাসার
অনন্তপুর, কুমিল্লা

[কবি সাহিত্যিকেরা গল্প, উপন্যাস কিংবা নাটক লিখতে গিয়ে কল্পনায় অনেক কাহিনী, অনেক ঘটনা সৃষ্টি করেন। বাস্তবে এমন কিছু ঘটনা আমাদের জীবনেও ঘটে, যা কল্পনায় তৈরি গল্প-উপন্যাসের ঘটনার চেয়েও ঘটনাময়।]

এটা নতুন একটা গল্প। অন্য সব গল্প থেকে একটু আলাদা, অন্য রকম। প্রেম ও নারী সম্পর্কে যে রকম গল্প আছে, এই গল্পটা সে রকম নয়। সিনেমার ঘটনাবহুল কোন আবেকঘন কাহিনীও নয়, যে দৃশ্য দেখে দর্শক চোখের জল ফেলে। কিংবা উপন্যাস নাটকের কল্পনায় যে কাহিনী তৈরি হয়, এই গল্পটা সে রকমও নয়। এই গল্পটা একজন স্বপ্নবাজ যুবককে নিয়ে, যে কিনা মরে গিয়েও পৃথিবীতে বেঁচে ছিল।

নুহাশপল্লীতে যখন, তখন ...

আমি আগে কখনো নুহাশপল্লীতে যাই নি। হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে একটা গল্প লিখব বলে যেতে হল সেদিন। চৈত্রের দুপুরে রোদের তাপ ও যানজট একটু বেশি হয় বলে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম আমরা। আমরা মানে- তালিব, আমি ও নূরজাহান। কিন্তু ততক্ষণে পুরো শহর আলো করে সূর্য তার রোদের অগ্নিতাপ ছড়াতে শুরু করেছে। বাসা থেকে কিছু দূর এগিয়েই প্রত্যেক দিন যা ঘটে সেই ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়লাম। জ্যামটা বেশি বড় নয়, বড়জোর পাঁচ মিনিট লাগতে পারে। আমরা গাড়িতে বসে আছি। আমাদের সঙ্গে তেমন কোন জিনিসপত্র নেই। আমার সঙ্গে শুধু একটা চামড়ার কালো ব্যাগ। ভেতরে কয়েকটা বই ও লেখার কাগজ-কলম।

ঘড়িতে বারোটা পঁয়তাল্লিশ।

নুহাশপল্লীতে পৌঁছানোর কথা সাড়ে এগারোটার মধ্যে। একঘণ্টারও বেশি সময় ওভার হয়ে গেছে। নুহাশপল্লীতে এখনো পৌঁছানো হল না।

আমার ধারণা ছিল, গাজীপুরে ঢাকা মহাসড়কের পাশেই হবে নুহাশপল্লী। মূল রাস্তা থেকে বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে সামনে এগিয়ে চলেছি তো চলেছিই-।

ড্রাইভার আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'এখন কোন্ দিকে যাব?'

তালিব আগে দুয়েকবার গিয়েছিল নুহাশপল্লীতে। তার পথ চেনা। তালিব বলল, 'পাকা রাস্তা থেকে আবার কাঁচা রাস্তায় ঢুকতে হবে।'

আমি বললাম, 'ড্রাইভার, গাড়ি থামিয়ে কাউকে জিজ্ঞেস করে নাও।'

ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে একজন লোককে জিজ্ঞেস করল, 'ভাইসাব, নুহাশপল্লী যাব কোন্ পথে?'

লোকটি বলল, 'ইলিট্রিকের খাম্বা দেখে দেখে এগিয়ে যান।'

আমরা সামনে এগিয়ে চলেছি। কিছুটা এগিয়েই একটা গাছে নুহাশপল্লীর অবস্থান সম্পর্কে নির্দেশিকা দেখতে পেলাম। আরেকটু এগিয়ে যেখানে ইলিট্রিকের খাম্বা শেষ হয়েছে সেখানেই নুহাশপল্লীর দেখা মিলল। প্রাচীর ঘেরা

বিশাল এলাকা। সুবিশাল ফটক। ফটকের কাছে একজন লোক দেখে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। পরিচয় দিতেই ফটক উন্মুক্ত করে দিল লোকটি। আমরা ভেতরে ঢুকলাম। হুমায়ূন আহমেদ কোথায়? ভেতরে ঢুকেই প্রিয় এই লেখককে দৃষ্টি ও মন খুঁজতে লাগল। কিন্তু তার আগে নুহাশপল্লী দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। আকাশছোঁয়া সবুজ বৃক্ষরাজি। ঐ বৃক্ষরাজির ওপর দিয়ে অনেকগুলো বালিহাঁস উড়ে গেল একেবারে আকাশের নীল ছুঁয়ে ছুঁয়ে। এতগুলো বালিহাঁস একসঙ্গে আগে কখনো দেখি নি। এই প্রথম আসা বলে পুরো নুহাশপল্লী ঘুরে দেখতে লাগলাম। ১০০ বিঘা জমির ওপর গড়ে তোলা হয়েছে নুহাশপল্লী। কী নেই এখানে! মিনি চিড়িয়াখানা, শিশুপার্ক, সিমেন্টের তৈরি রাক্ষস-মুখ বসানো উঁচু করে। মনে হল, রূপকথার দানব পাতাল থেকে মাথা আর দুই হাতের কব্জি বের করে দাঁড়িয়ে আছে। একপাশে হরিণদল দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। গোয়াল ঘরে গরু, পাখিশালায় পাখি আর চিড়িয়াখানায় বানর চোখে পড়ল।

হঠাৎ তালিব বলল, 'এ্যাই, ওদিকে দেখ দেখ।'

আমি তাকালাম সেদিকে। তাকিয়ে দেখি গাছের ওপর ঘর! হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস-নাটকে এমন চরিত্রের সন্ধান পেয়েছি যে চরিত্রটি গাছের ওপর ঘর বানিয়ে বসবাস করে। আজ চোখে দেখলাম। অন্যপাশে গেস্ট হাউজ, নাম বৃষ্টি বিলাস। বৃষ্টি বিলাস প্রকৃতই বৃষ্টি বিলাসের হাউজ। ওপরে টিনের চাল দেওয়া যেন বৃষ্টি পড়লে শব্দ হয়। টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ হুমায়ূন আহমেদের খুব প্রিয়।

নুহাশপল্লীতে পার্কের মতো স্থায়ী অস্থায়ী আসন গড়া। পার্কে এসব আসনে প্রেমিক প্রেমিকা জুটি বসে গল্প করতে দেখা যায়, এখানে সে রকম কাউকে দেখা গেল না।

মূল ভবনের সামনে আমরা বসলাম। কিছুক্ষণ পর এলেন হুমায়ূন আহমেদ। পরিচয়, সালাম ও নুহাশপল্লীতে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য জেনে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, তার আগে পুরো পল্লী ঘুরে দেখে নাও।'

আমি বললাম, 'জ্বী স্যার, দেখেছি।'

হুমায়ূন আহমেদ বললেন, 'দেখা হয়ে গেছে?'

'জ্বী, দেখেছি, দেখছি ।'

'চলো, পুকুর পাড়ে যাই, এখন মাছ মারা হবে।'

হুমায়ূন আহমেদ এক কর্মচারীকে নির্দেশ দিলেন পুকুরে মাছ মারতে। আমরা তাঁর পিছনে পিছনে হেঁটে পুকুর ঘাটে এসে দাঁড়ালাম। পুকুরে দুটো ঘাট। একটি সাধারণ, গ্রামে যেমন থাকে। অপরটি শ্বেতপাথরে বাঁধানো।

হুমায়ূন আহমেদ বললেন, 'জোছনা রাতে এই ঘাটে বসে জোছনা দেখি। শ্বেতপাথরে জোছনার আলো বিচ্ছুরিত হলে বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠে।'

জোছনার প্রসঙ্গ আসতেই আমি বললাম, 'স্যার, আমি আপনার "জোছনা ও জননীর গল্প" বইটি তিন বছর ধরে পড়ছি, কিন্তু শেষ করতে পারছি না ।'

হুমায়ূন আহমেদ বললেন, 'আমি বইটির কাহিনী তিরিশ বছর ধরে বহন করেছিলাম, লেখা শেষ করে মনে হয়েছিল এবার মরে গেলেও কোনো আক্ষেপ নেই।'

নূরজাহান বলল, 'স্যার, গল্প, উপন্যাস কিংবা নাটক লিখতে গিয়ে তো কল্পনায় অনেক কাহিনী, অনেক ঘটনা সৃষ্টি করেন। বাস্তবে এমন কোনো ঘটনা কি আপনার জীবনে ঘটেছে, যা কল্পনায় তৈরি গল্প-উপন্যাসের ঘটনার চেয়েও ঘটনাময়?'

হুমায়ূন আহমেদ বললেন, 'হ্যাঁ, আমার জীবনে তেমন একটি ঘটনা ঘটেছে। যা গল্প-উপন্যাসের কাল্পনিক কাহিনীর চেয়েও অদ্ভুত ও ঘটনাময়।'

নূরজাহান বলল, ' প্লিজ, আপনার জীবনের সেই অদ্ভুত ঘটনাটা কি আমাদের বলবেন?'

আমি ও তালিব এতক্ষণ চুপ করে ছিলাম। এবার আমরাও অনুরোধ করলাম, 'স্যার, সেই ঘটনাটি বলুন।'

হুমায়ূন আহমেদ রাজি না হয়ে পারলেন না। বললেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, বলছি।'

আমি, তালিব ও নূরজাহান একটু নড়েচড়ে বসে হুমায়ূন আহমেদের বাস্তব ভিত্তিক গল্প শোনার জন্য প্রস্তুত হলাম।

বিড়ালরূপী মানুষ ...

আমরা শ্বেতপাথরে বাঁধানো পুকুর ঘাটে বসেছি। মাছ মারতে এসে কর্মচারীটাও আমাদের পাশে বসল। গল্পটা শেষ হলেই মাছ মারা হবে। আরেক কর্মচারী চা নিয়ে এলো। আমরা হাতে হাতে চায়ের কাপ নিলাম। হুমায়ূন আহমেদ কাপে চুমুক দিয়ে ধীর গলায় বলতে লাগলেন, 'আমার ধানমণ্ডির বাসার পাশের ফ্ল্যাটে জাহিদ নামে একটি ছেলে থাকত। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরি করি। জাহিদ কোন কাজ করে না। গ্রাম থেকে এসেছে। কাজ খুঁজছে। পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থাকে বলে জাহিদ প্রায় আমার ঘরে আসত। খুব ভদ্র ও বিনয়ী বলে ওকে আমার পছন্দ হল। আমি মাঝরাত অবধি জেগে লেখালেখি করি। প্রায় রাতে জাহিদ এসে আমার কক্ষে বসে থাকত। মাঝেমধ্যে আমার ঘরে ঘুমাতও। হঠাৎ একরাতে আমি আবিষ্কার করলাম, জাহিদ কোন সাধারণ মানুষ নয়। ওর মাঝে অলৌকিক শক্তি আছে। মানুষের মাঝে যদি অলৌকিক শক্তি থাকে তাহলে সেই মানুষ আর সাধারণ মানুষ থাকে না। অসাধারণ মানুষে পরিণত হয়ে যায়। লক্ষ্য করলাম, জাহিদের অলৌকিক শক্তি এতটাই প্রবল যে ওকে আমার মানুষ মনে হলো না। মনে হলো, ও যেন অন্য গ্রহের কেউ। অন্য আত্মা কিংবা জ্বীন-পরী।

একরাতে জাহিদ নিজের ঘর ছেড়ে আমার সঙ্গে এসে শুয়েছে। হঠাৎ গভীর রাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি বাথরুমে যাওয়ার জন্য উঠলাম। বাতি জ্বেলে দেখি জাহিদ ঘরে নেই। সে তো আমার পাশেই শুয়েছিল। এখন কোথায় গেল? নিশ্চয়ই বাথরুমে ঢুকেছে। আমি ওকে বাথরুমে খুঁজলাম, নেই। তাহলে কি বাইরে বেরিয়েছে? বারান্দায় কিংবা ছাদে? না, বারান্দায় বা ছাদে কিংবা অন্য কোথাও যায়নি সে। কেননা, ঘরের ভেতর থেকে দরজা লাগানো। বাইরে গেলে দরজা খোলা থাকতো। তাহলে জাহিদ গেল কোথায়? আমার মনে একটু একটু দুশ্চিন্তা হতে লাগল। আমি হঠাৎ দেখতে পেলাম আমার খাটের নিচে একটা বিড়াল ঘুমিয়ে আছে। তাহলে কি এটাই জাহিদ? শুনেছি, তবে সত্যি কি না জানি না। অন্য আত্মা, জ্বীন কিংবা পরী নাকি মানুষের সুরতে ঘুমাতে পারে না। তাই তারা অন্য কোন প্রাণীর রূপধারণ করে ঘুমায়। জাহিদ কি এখন বিড়ালের রূপধারণ করে ওখানে ঘুমিয়ে আছে? আমার শোবার ঘরে তো কখনো বিড়াল দেখি নি। এখন বিড়ালটা এলো কোত্থেকে? সত্যিই কি এই বিড়ালটাই জাহিদ?

ধ্যাৎ! জাহিদ বিড়াল হতে যাবে কেন? ও তো মানুষ, বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

আমি বাথরুমে ঢুকলাম। পাঁচমিনিট পরে ফিরে এলাম সেখান থেকে। এসে দেখি জাহিদ বিছানায় শুয়ে ঘুমাচ্ছে। সে কোত্থেকে এলো এখন? এতক্ষণই বা

কোথায় ছিল? দরজাটা আগের মতোই ভেতর থেকে লাগানো। জাহিদ ঘর থেকে বাইরে যায় নি। বাইরে থেকেও ঘরে আসে নি। তাহলে জাহিদ এতক্ষণ কোথায় ছিল? এখনই বা কোত্থেকে এলো? আমি খাটের নিচে তাকালাম। না, বিড়ালটা নেই সেখানে। সারা ঘরে বিড়ালটাকে খুঁজলাম। কোথাও দেখতে পেলাম না। তবে কি জাহিদই বিড়ালের রূপধারণ করে ঘুমিয়েছিল? শুনেছি, তবে সত্যি কিনা জানিনা। অন্য আত্মা কিংবা জ্বীন-পরী নাকি মানুষের সুরতে ঘুমাতে পারে না। তাই তারা অন্য কোন প্রাণীর রূপধারণ করে ঘুমোয়। জাহিদ কি অন্য আত্মা কিংবা জ্বীন অথবা পরী? আমি বিস্ময়ে ত, থ, দ, হয়ে চুপচাপ বসে রইলাম।

এরপর আমি জাহিদকে বহু রাতে বিভিন্ন জীব-জন্তুর রূপধারণ করে ঘুমোতে দেখেছি। কিন্তু আমি এসব কথা জাহিদকে বা অন্য কাউকে ঘুনাক্ষরেও বলিনি। এক সময় আমি আবিষ্কার করলাম, জাহিদ আসলেই সাধারণ কেউ নয়, অসাধারণ একজন মানুষ। শুধু কি অসাধারণ? অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক ও অদ্ভুত একজন মানুষ সে।

জ্বীনের কাছ থেকে বাচ্চা উদ্ধার ...

একদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে আমি জাহিদকে ডেকে বললাম, 'জাহিদ তৈরি হয়ে নাও। দু'জনে এক জায়গায় যাব।'

জাহিদ জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবেন?'

'গ্রামে যাব।'

'কেন গ্রামে যাবেন কেন?'

'বেড়াতে।'

'ঠিক আছে, আমি রেডি হয়ে আসছি।'

জাহিদ নিজের রুমে চলে গেল। দশ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে ফিরে এলো সে। আমিও কাপড় চোপড় পড়ে বেরিয়ে পড়লাম। চারঘণ্টা ট্রেন ভ্রমণ শেষে গ্রামে পৌঁছালাম।

গ্রাম হলেও একেবারে গ্রাম নয়। মফস্বল শহরই বলা যায়। আমাদের বাড়িটা গ্রামের একবারে শেষ মাথায়। দু'জনে বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। দেখলাম একদল মানুষ জটলা বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। লক্ষ্য করলাম, সবাই কেমন গম্ভীর, কেমন চিন্তিত। সবাই অমন গম্ভীর, অমন চিন্তিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন? বাড়িতে কি কারো কিছু হয়েছে?

বাড়ির ভেতর থেকে একজন মাঝবয়েসী লোক বেরিয়ে এলো। যে লোকটি বেরিয়ে এলো সে আমার কাজিন আসাদ। আমার চেয়ে বয়সে তিন বছরের বড়। আসাদ বলল, ' তুমি কখন এলে?'

আমি বললাম, 'এই তো, এখনই এলাম।'

'তা তুমি কেমন আছো?'

'ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন?'

'আছি কোনো রকম। এদিকে কী কাণ্ড হয়েছে, শুনেছে তো?'

'না তো। কী হয়েছে?'

আমার বুকের ভেতরটা মোচর দিয়ে উঠল।

'যাও, বাড়ির ভেতরে। গেলেই দেখতে পাইবা।' বলেই আসাদ ব্যস্ত মানুষের মতো তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল।

আমি ঘরের ভেতরে ঢুকলাম। খাটের একপাশে আধাশোয়া হয়ে আছে আমার আরেক কাজিন জেসমিন। ওর চোখ দুটি ফোলা ফোলা। মনে হয় ও কেঁদেছে। কেঁদেছে অনেকটা সময় ধরে। কেঁদে কেঁদে এখন ক্লান্তশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তাকে ঘিরে কয়েকজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। কেউ আছে বসে। আমি ঘরে ঢুকতেই আমাকে দেখে ছোট বাচ্চার মতো হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

আমি বললাম, 'কী হয়েছে?'

জেসমিন কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'খোকা রাত থেকে কিছু খাচ্ছে না। সকাল বেলা বমি করেছিল। তারপর থেকে অজ্ঞান হয়ে আছে।'

খোকা মানে- জেসমিনের সদ্য জন্ম নেওয়া বাচ্চা। গতকালই বাচ্চাটা হয়েছে। ছেলে হয়েছে বলে জেসমিন বেশ খুশি হয়েছিল। কিন্তু তার এই খুশির লগনটা দীর্ঘস্থায়ী হলো না। মাত্র একরাত্রি। জেসমিনের কান্না আর থামে না। সে কেঁদে কেঁদে বলল, 'ভাইজান, আমার খোকার কী হলো? খোকা কি মরে গেছে?'

আমি কিছু বলতে পারলাম না। দু'ঠোঁট চেপে ধরে রাখলাম দাঁত দিয়ে। আমার চোখ থেকেও অশ্রুকণা ঝরতে লাগল।

জাহিদ জিজ্ঞেস করল, 'অজ্ঞান হয়ে আছে কখন থেকে?'

অন্য একজন মহিলা বলল, 'সকাল থেকেই।'

জাহিদ বলল, 'রাতে বাচ্চার সাথে কে কে ছিল?'

অন্য আরেকজন মহিলা বলল, 'আমি আর বাচ্চার মা ছিলাম।'

'আপনি বাচ্চার কে হন?'

'দাদী।'

'রাতে ঘরে বাতি জ্বলা ছিল?'

'হ্যাঁ, ছিল।'

'সারা রাতই কি বাতিটা জ্বেলে রেখেছিলেন?'

'না। শেষ রাতে নিভিয়ে ফেলেছিলাম।'

'তখন কি ঘরের বাইরে থেকে কেউ আপনাদের ডেকেছিল?'

'না।'

'আপনারা কি রাতে কখনো ঘরের বাইরে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। বাচ্চার মা বাথরুমে গিয়েছিল। সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম।'

'তখন কি বাচ্চাটা ঘরে একা ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'বুঝতে পেরেছি।'

জেসমিনসহ অন্যান্য মহিলারা জাহিদের কথাটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ওর দিকে উৎসুক চোখে তাকালো।

জাহিদ আবার বলল, 'তখন কেউ আপনাদের ডেকেছিল কিনা, বলুন তো?'

জেসমিন বলল, 'আমি তো বাচ্চাটাকে নিয়ে মগ্ন ছিলাম, কেউ ডেকেছিল কিনা বুঝিনি।'

জাহিদ বলল, 'ডাক্তারকে কি খবর দেওয়া হয়েছে?'

পাশেই দাঁড়িয়ে, বাচ্চার বাবা। সে বলল, 'ডাক্তারকে আগেই খবর দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার এসে দেখেও গেছে। ডাক্তারের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়।'

জাহিদ বলল, 'ডাক্তার ঠিকই বলেছে। এক কাজ করুন, বড় একটা পাতিল ভরে পানি আগুনে জ্বাল দিয়ে গরম করুন।'

আমি জানতে চাইলাম, 'জাহিদ, পানি গরম করে কী হবে?'

জাহিদ শান্ত গলায় বলল, 'দেখি না কী হয়?'

তারপর জাহিদ জেসমিনকে বলল, 'আপা, বেশি উতলা হবেন না। আপনার ছেলের কিছুই হয়নি।'

জাহিদের কথায় জেসমিন আশ্বস্থ হল বলে মনে হচ্ছে না। সে অশ্রুসিক্ত হয়ে বলল, 'আমি কিছু জানি না। তোমরা আমার ছেলেকে ভালো করে দাও।'

'আচ্ছা দেখছি।' বলেই জাহিদ আমাকে বলল, 'চলেন কোথাও বসি। পানি গরম হোক।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা দু'জনে। জাহিদ আমাকে ডেকে একটা গাছের তলায় নিয়ে গিয়ে নিচু গলায় বলল, 'বুঝলেন, বাচ্চাটাকে জ্বীনের আছর করেছে। জ্বীনটা বড় চালাক। সেটাই বেশি চিন্তার ব্যাপার। বাচ্চার মাকে তা বলা যাবে না।'

আমি জাহিদের কথায় পাত্তা দিলাম না। ও কীসের জন্য পানি গরম করে আনতে বলেছে, তাও আমলে নিলাম না। আমি একটা সিগারেট ধরালাম। জ্যোতিষি, ঋষি, কবিরাজ, ফকির, দরবেশ ও সন্নাসী টাইপের লোকদের প্রতি আমার একটু তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাব আছে। জাহিদ সেরকম কেউ নয়। কিন্তু ও যে কে এবং কী ধরনের মানুষ সেতো আমি ভালো করেই জানি। এ কারণে ও কবিরাজী স্টাইলে পানিগরম করে আনতে হুকুম করে যে আমাকে বলেছে, 'দেখি না কী হয়।' আমি ওর ওপর একটু আস্থা রেখে মনে মনে বললাম, 'দেখিই না কী হয়?'

জাহিদ পাতিল ভরে পানিগরম করতে বলাতে সবার মাঝেই একটা কৌতূহলভাব বিরাজ করছিল, কিন্তু সবার সেই কৌতূহল নিমেষেই কর্পূরের মতো উবে গেল তখন, যখন ও বলল, 'বাচ্চাটাকে এই পাতিলভরা গরম পানিতে ফেলে দেন।'

বলে কি লোকটা! পাগল টাগল নাকি! অমন গরম পানিতে ফেলে দিলে কি বাচ্চাটা বাঁচবে? মরে একেবারে আলুসিদ্ধ হয়ে যাবে না! বাচ্চার হয়তো অসুখ করেছে তাই দুধ খাচ্ছে না। অসুখ সেরে গেলেই খাবে। তাই বলে কি অমনগরম পানিতে ফেলে মেরে ফেলতে হবে?

জেসমিন কিছুতেই ওর খোকাকে পাতিলের ঐ গরম পানিতে ফেলে দিতে দিবে না। শুধু জেসমিন কেন, বাড়ির সবাই রীতিমত জাহিদের উপর ক্ষ্যাপে গেল। কেউ ওকে পাত্তা দিল না। কিন্তু আমিতো জানি যে জাহিদ একজন অসাধারণ, অদ্ভুত ও অতিপ্রাকৃত মানুষ। ও যখন বাচ্চাটাকে গরম পানিতে ফেলে দিতে চাইছে, নিশ্চয়ই এত কোন না কোন ফল পাওয়া যাবে। তাই বাড়ির সবার অমতে, জেসমিনের আকাশকাঁপানো চিৎকার চেঁচামেচি উপেক্ষা করে আমি বাচ্চাটাকে পাতিলের ঐ গরম পানিতে ফেলতে সাহায্য করলাম জাহিদকে। বাচ্চাটাকে পাতিলের ভেতরের গরম পানিতে ডুবিয়ে একট ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো। কিছুক্ষণ পর ঢাকনা খুলে পাতিলের ভেতর থেকে বের করে আনা হলো বাচ্চাটাকে। এ কি! দু'চোখে ভুল দেখা যাচ্ছে না তো! বাচ্চা কোথায়? এ তো দেখতে পাচ্ছি এক দাড়কাক। বাচ্চাটা পাতিলের গরম পানি থেকে কোথায় উধাও হয়ে গেল? এ তো জুয়েল আইচের জাদুর মতো মনে হচ্ছে! এ জাদু নয় তো? জাহিদ কি জাদু জানে? ওকি জাদু দেখাচ্ছে?

জাহিদ সবাইকে কাছে ডেকে বলল, 'বুঝলেন, এটা বাচ্চা ছিল না, ছিল দাড়কাক। জ্বীন রাতে বাচ্চাটাকে চুরি করে নিয়ে গেছে। এই কাকটা জ্বীনের কারসাজিতে বাচ্চাটার রূপধারণ করেছিল। আসল বাচ্চাটা আপনাদের বাড়ির

পাশের পুকুর পাড়ের বাঁশঝড় খুঁজে দেখুন, ঐখানেই আছে। জ্বীন সেখানে রেখে পালিয়ে গেছে।'

বাড়ির সবাই যারপর নাই অবাক হয়ে কৌতূহলভরা মন নিয়ে ছুটে চলল পুকুর পাড়ে। সেখানে গিয়ে জাহিদের কথামতো ঠিকই বাচ্চাটা পাওয়া গেল।

সেদিনের ঘটনার পর জাহিদকে আমি বারবার বলেও এসবের রহস্য জানতে পারিনি। ও কিছুতেই রহস্যটা উন্মোচন করতে চাইল না। তবে আমি হতাশ হলাম না। ওর সমস্ত রহস্য উন্মোচনের জন্য একটি সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। হঠাৎ এক রাতে সুযোগটা পেয়ে গেলাম।

সত্যিকারে গল্পের শুরু ...

রাতে আমি আমার লেখার টেবিলটাকে ঝেড়ে পুছে গুছালাম। কী লিখি? কী লিখি? ধ্যানী সাধকের মতো সুকান্তের ভঙ্গীতে গালে হাত দিয়ে বসে ভাবছি, ভাবছি আর ভাবছি। একটি পত্রিকার সম্পাদক ঈদ সংখ্যায় ছাপানোর জন্য একটা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি চেয়েছেন। ভদ্রলোক সকাল-বিকাল ফোন করেন। লেখা কতদূর এগোল জানতে চান।

আমি অনেকটা সময় ধরে নির্বিকার বসে আছি। মাথার ভেতরে লেখা তৈরির ভাবনা কিলবিল করছে। কিন্তু কী লিখি? হঠাৎ মনে হলো, এখন একটা ভূতের গল্প লেখা যাক।

আমি বসা থেকে উঠে ধীর পায়ে হেঁটে বুকসে্লফের দিকে গেলাম। লেখার প্রস্তুতি স্বরূপ সেল্‌ফ থেকে কিছু বই বের করে সেগুলোতে চোখ বুলিয়ে নেওয়া আমার অভ্যেস। আমার মনে যখন অনুভূতির চাঞ্চল্য স্থির হয়ে যায় তখন অবচেতন মনে ভাবের সন্ধানে সেলফের তাকে তাকে বসে থাকা রবীন্দ্রনাথ-নজরুল, জীবনানন্দ দাশ কিংবা কার্লমার্কস-শেলী-রোঁমারোলাদের শরণাপন্ন হই। শৈল্পিক অনুপ্রেরণা খুঁজি তাঁদের কাছে। কখনো কখনো পেয়েও যাই।

আমি সেল্‌ফের তাক থেকে একটা মোটা বই বের করে ফের লেখার টেবিলে এসে বসতেই দরজার ওপাশে কেউ একজন নক করল। এত রাতে আমার ঘরের দরজা নক করতে পারে যে, সে জাহিদ। আমি বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললাম, 'এসো, দরজা খোলাই আছে।'

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো জাহিদ।

'কী করছিলেন?' জাহিদ ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞেস করল।

আমি আনমনাভাবে বললাম, 'একটা গল্প খুঁজছি।'

জাহিদ আমার পাশের চেয়ারটাতে বসতে বসতে বলল, 'গল্প খুঁজছেন মানে? এ আবার খুঁজতে হয়? আমাকে নিয়ে লিখে ফেলেন না। আমার জীবনে কিন্তু একটা চকৎকার গল্প আছে।'

আমি মনে মনে ভাবলাম, এইতো সুযোগ! এতদিন ধরে একই ফ্ল্যাটে, একই সঙ্গে বসবাস করা আমার এই অতি প্রাকৃত ও অদ্ভুত ছেলেটির রাতে বিড়ালের রূপধারণ করে ঘুমানো, সেদিন জেসমিনের ছেলেকে জ্বীনের কাছ থেকে অদ্ভুতভাবে উদ্ধার করা ইত্যাদি সমস্ত রহস্য উন্মোচনের এত বড় সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।

আমি জাহিদকে বললাম, 'আরে তাইতো! আমি তো এটা ভাবি নি? তোমাকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখে ফেলিনা কেন?'

জাহিদ যেন খুশি হল। বলল, 'লিখেন আমাকে নিয়ে। জানি, আমি আপনার গল্পের নায়ক হবার যোগ্য নই।'

'আরে না। তুমি তো চমৎকার ছেলে। স্মার্ট ও আধুনিক, অনেকটা সিনেমার হিরোদের মতো।'

'এত প্রশংসা করলে কিন্তু আমি পাগল হয়ে যাবো। তখন কী বলতে কী বলে ফেলব ঠিক নেই।'

আমি মনে মনে বললাম, 'তবেই তো আমার সুবিধে। কারণ- তখন তুমি বেপরোয়া হয়ে নিজকে প্রকাশ করবে।'

জাহিদ বলল, 'বলেন, আমাকে নিয়ে লিখলে, কী করতে হবে?'

আমি বললাম, 'কিছুই করতে হবে না। মাঝেমধ্যে আমার চা কিংবা পানির পিপাসা পেলে খাওয়াবে, ব্যস।'

জাহিদ হাসল। বলল, 'ঠিক আছে, এবার শুরু করে দেন। তবে শুরু করতে হবে আমার দেহের বর্ণনা দিয়ে। লিখেন, ছেলেটা দেখতে একেবারে রাজপুত্রের মতো। ইচ্ছে করলে প্রশংসাও করতে পারেন আপনি এভাবে, মাথার চুল কোঁকড়ানো, চোখ দুটো পাখির বাসার মতো, দেহের গঠন পুরুষালি... ।'

আমি ওর কথায় অভিভূত হয়ে বললাম, 'বলে যাও। তুমিই বলে যাও। পরে আমি গুছিয়ে লিখব।'

জাহিদ রাজি হলো। বলল, 'ঠিক আছে। আমিই বলছি।'

তারপর আমি অন্য এক জাহিদকে আবিষ্কার করলাম। এ যেন সেই জাহিদ নয়। যে জাহিদ অন্য রকম, অসাধারণ, অদ্ভুত, অতিপ্রাকৃত। এ জাহিদ পুরোপুরি বাস্তববাদী এক তরুণ।

জাহিদ ধীরে ধীরে তার জীবনের গল্প বলতে লাগল,- 'জীবন থেকে কেটে গেছে এক দুই তিন করে তিরিশটি বসন্ত। কিন্তু এখনো আমি জীবনের মূলে যেতে পারলাম না, উঠতে পারলাম না চূড়োয়। পারলাম না প্রবেশ করতে জীবনের খুব গভীরে। অথচ শৈশব-কৈশোর থেকে জীবনে কত কিছু হতে চেয়েছি। তখন যা কিছু দেখতাম ভালো, তা-ই হতে ইচ্ছে করত, হতে চাইতাম। কিন্তু তার কোনো একটাও হতে পারলাম কই?

একবার আমাদের গ্রামে যাত্রাপালা হয়েছিল। নবাব "সিরাজ-উদ-দৌলা" ছিল যাত্রাপালাটির নাম। সেই যাত্রাপালায় যে ছিল নায়ক তাকে দেখে আমি মনে মনে ঠিক করেছিলাম, যে ভাবেই হোক আমাকে যাত্রাপালার নায়ক হতে হবে। আমার সম্মুখে হাজার হাজার দর্শকস্রোতা উন্মুখ হয়ে বসে থাকবে। আমি মঞ্চে উঠে নায়ক নায়ক ভাব নিয়ে দরাজ গলায় উচ্চারণ করব, -"বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মহান অধিপতি... ।"

তখন মুহুর্মুহু করতালিতে অভিনন্দন জানানো হবে আমাকে। আমার অভিনয় শৈলীতে মুগ্ধ হয়ে হুররে হুররে ধ্বনি তোলে দর্শক স্রোতা সকল গমগম করে ভরে তুলবে পুরো থিয়েটার হল। আমি মনে মনে খুঁজে পাব জীবনের স্বার্থকতা।

কিন্তু চাইলেই কি আর তা হওয়া যায়?

একবার টেলিভিশনে দেখেছিলাম ক্রিকেট খেলা। সেই খেলায় ভারতের প্রতিপক্ষ ছিল পাকিস্তান। আমি বিস্ময় হয়ে দেখেছিলাম পাকিস্তানের ব্যাটসম্যান জাভেদ মিয়াঁদাদের ব্যাটিং। ভীষণ আকৃষ্ট হয়েছিলাম তখন, যখন দেখেছিলাম শেষ বলে ছক্কা মেরে পাকিস্তানকে জিতিয়ে দিয়েছিল সে। তখনই আমি ঠিক করেছিলাম, যে ভাবেই হোক আমাকে ক্রিকেট খেলোয়াড় হতেই হবে।

আমি আমার দেশ, বাংলাদেশের হয়ে ব্যাট করতে নেমেছি ভারত কিংবা পাকিস্তানের বিপক্ষে। বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে গ্যালারিতে তখন হাজার হাজার দর্শক তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ত্রিশগজ পিচের এক প্রান্তে উইকেটের সামনে ব্যাট হাতে দাঁড়িয়ে আমি, অন্য প্রান্তে বল হাতে ছুটে আসছে কপিলদেব কিংবা ওয়াসিম আকরাম। আমি তোয়াক্কা করি না ওসব বোলারদের ঠিক এরকম একটা ভাব আমার মাঝে। আমি একের পর এক চার ও ছয় মেরে গড়ে তুলছি আমার ব্যক্তিগত ইনিংস। প্রথমে অর্ধশত, পরে শতক। ক্রিকেটের ভাষায়-সেঞ্চুরি।

আমি যখন নিরান্নব্বই রানে তখন হাজার হাজার দর্শক স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে কিংবা টেলিভিশনের সামনে বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছে উৎসুক চোখে। আমি কাভার ড্রাইভ, স্কয়ার ড্রাইভ, কিংবা লেগ কার্ট ধরনের কোন

একটা শর্ট খেলে নিয়ে নিলাম এক রান। পূর্ণ হলো সেঞ্চুরি আমার। গ্যালারিতে উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকা হাজার হাজার দর্শক হাতে তালি দিয়ে অভিনন্দন জানালো আমাকে। আমিও ব্যাট উপরে উচিয়ে ধরে ওদের অভিবাদন গ্রহণ করলাম। ঠিক এরকম কল্পনা করে আমি মনে মনে আনন্দ উপভোগ করেছি কতদিন!

একবার আমাদের বাড়িতে ভিসিডি আনা হয়েছিল। খড় বিছিয়ে উঠানে বসে আমরা রাতভর দেখেছিলাম উত্তম কুমার ও সুচিত্রা সেনের ছবি। মনে হয়েছিল তখন, আমিও উত্তম কুমারের মতো হলাম না কেন? তাহলেই তো সুচিত্রা সেনের মতো অমন সুন্দরি নারীর সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করতে পারতাম।

কিন্তু চাইলেই কি আর তা হওয়া যায়?

ছোট বেলায় যখন আমি প্রাইমারি স্কুলে পড়তাম- তখন প্রায় প্রতিরাতে আমার দাদুর মুখে গল্প শোনার অভ্যেস ছিল। দাদুর মুখে গল্প শুনতে আমার ভীষণ ভালো লাগত। দাদু আমাকে নতুন নতুন গল্প শোনাত। আমার দাদু বৃদ্ধ মানুষ, কিন্তু আদতে বেশ চঞ্চল ছিল। সবসময় কিছু একট করতে চাইত। একেবারে কিছুই করার না থাকলে আমাকে ডেকে মজার মজার গল্প বলা শুরু করত। আমি মনে সীমাহীন কৌতূহল নিয়ে শুনতাম সেসব গল্প। প্রায় প্রতি রাতেই দাদুর মুখে গল্প শুনে শুনে ঘুমানো একরকম অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। কোন রাতে দাদু গল্প না বললে আমার চোখে যেন ঘুমই আসত না। আমার দাদু যেসব গল্প বলত তা যতটা না অভিনব ছিল তার চেয়ে বেশি অভিনবত্ব ছিল গল্প বলার ভঙ্গিতে। যে কেউ দাদুর মুখে গল্প শুনলে মুগ্ধ হত। দাদু গল্প বলা শুরু করত এভাবে, 'এক দেশে এক রাজা ছিল... ।'

ব্যস। এইটুকুতেই আমার আনন্দ আর ধরে না।

'এক দেশে এক রাজা ছিল...!' সত্যিই কি কোনো এক দেশে এক রাজা ছিল? যদি থেকেই থাকে সে দেশটা কোথায়? কী নাম সেই দেশের? সেই রাজার নামই বা কী? তখন অত কিছুর জানার ইচ্ছে বা কৌতূহল কোনোটাই ছিল না আমার। আমি শুধু জানতাম, এক দেশে এক রাজা ছিল। আমার দাদু এভাবে গল্পটা শুরু করে সেই রাজাকে আমার কল্পলোকে এমনভাবে উপস্থাপন করত যে তখনই আমি মনে মনে ভাবতাম, 'ইস! আমি যদি রাজা হতাম...!'

কিন্তু কীভাবে রাজা হব? দাদুর গল্পে শুনেছি সাপের মাথায় মণি কিংবা ব্যাঙের মুখে এক ধরনের দামি পাথর থাকে, সেটা খুঁজে পেলে বিক্রি করে সাত রাজার ধনদৌলত পরিমাণ টাকাপয়সা পাওয়া যাবে। ইস! আমি যদি ব্যাঙের মুখের সেই পাথরটা খুঁজে পেতাম কিংবা সাপের মাথার মণিটা! কোথায় পাওয়া যাবে? দাদু বলেছে, যে সাপের মাথায় ঐ মনিটা থাকে সেই সাপটি মানুষের

আড়ালে চলে যায়। বন বাদাড়ে মাটির গর্তে, কিংবা গাছের খোড়লে লুকিয়ে থাকে। আর ব্যাঙের মুখে সেই দামি পাথরটা থাকলে ব্যাঙ সেটা মুখ থেকে বের করে মাটিতে রেখে রাতের আঁধারে সেই পাথরটার আলোয় খাবার খুঁজে ফিরে। আমি তখন মনে মনে ভাবতাম, যদি এমন হতো। আমি সেই পাথরটি খুঁজতে বেরিয়েছি। একটু খোঁজাখুঁজির পরেই দেখি একটি ব্যাঙ মুখ থেকে পাথরটি বের করে মাটিতে রেখে খাবার খুঁজছে। খাবার খুঁজতে খুঁজতে একটু দূরে চলে গেছে আর অমনি আমি পাথরটি খপ করে তুলে নিয়ে বাড়ি চলে আসতাম! এমন হতেই পারে। পারে না?

পরদিন রাতের গভীরে আমি আমাদের বাড়ির পাশের জঙ্গলে গেলাম। কাউকে না জানিয়ে। এমন কি আমার বাবা-মাকেও না। ওদের জানালে যেতে দিত না। তাহলে আমার ইচ্ছেটা ব্যর্থ হয়ে যেত। আমার আর সাপের মণি কিংবা ব্যাঙের মুখের দামী পাথর পাওয়া হবে না। তাই ওদের জানাইনি।

জঙ্গলের ধারে যেতেই কে যেন ডেকে আমাকে বলল, 'এসো এসো!'

আমি অবাক হয়ে চারপাশে তাকালাম। কোথাও কাউকে দেখতে পেলাম না।

জঙ্গলের ভেতরে ঢুকতেই বকুল ফুলের মিষ্টি ঘ্রাণ পেলাম। আহ! কী সুন্দর বকুলের ঘ্রাণ! মনটা ভরে উঠল অজানা আবেশে। হঠাৎ বয়ে যাওয়া উত্তরের দমকা হাওয়ায় গাছেরা নড়াচড়া করে উঠল। ঝরে পড়তে লাগল শুকনো পাতাগুলো। আকাশে চাঁদ নেই। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। গ্রামের সব মানুষ ঘুমিয়ে। কোথাও কেউ জেগে নেই। আমি শুধু একা একা হেঁটে বেড়াচ্ছি। একটুও ভয় পাচ্ছি না। মন থেকে সব ভয়-ডর উধাও হয়ে সেখানে এখন বাসা বেধেছে সাপের মণি ব্যাঙের মুখের দামি পাথর। সেটাই খুঁজে বেড়াচ্ছি...।

হঠাৎ কে যেন আবার বলে উঠল, 'কী খুঁজছ তুমি?'

আমি এবার ভয় পেয়ে গেলাম। এই রাতের আঁধারে জঙ্গলে কে কথা বলে? আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। ভয়ে গলা শুকিয়ে গলার স্বর বেরোল না। তবু কোন মতে ঢোক গিলে বললাম, 'কে?'

কোথাও কাউকে দেখতে পেলাম না। চারপাশে তাকালাম। কোথাও কেউ নেই। তাহলে কথা বলল কে?

অদৃশ্য কণ্ঠটা আবার বলল, 'তুমি রাজা হতে চাও, তাই না? এ জন্য তুমি সাপের মণি খুঁজছ?'

এতক্ষণ ভয় হচ্ছিল আমার। এবার ভয়ে আমার সারা শরীর একেবারে হিম হয়ে গেল। বরফের মত ঠান্ডা গলায় আমি বললাম, 'তুমি কে?'

অদৃশ্য কণ্ঠটা আবার বলল, 'সত্যি করে বলো, তুমি কি রাজা হতে চাও না?'

আমি অস্বীকার করতে পারলাম না। বললাম, 'হ্যাঁ, তা-ই চাই। কিন্তু আমার এ আশা কি পূরণ হবে?'

'হবে হবে।' বলেই বকুল গাছের খোড়ল থেকে একটা বড় সাপ বেরিয়ে এলো। আমি ভয় পেয়ে দুচোখ বন্ধ করলাম।

সাপ বলল, 'চোখ খোল।'

সাপ আমার সামনে অনেকগুলো মণি রেখে বলল, 'এই নাও মণি।'

অনেকগুলো মণি আমার হাতে চলে এলো। জাদুর মতো মনে হলো বিষয়টা। আমি তখন নিজেকে রাজা ভাবতে শুরু করলাম। দাদু বলেছে সাপের মাথার মণি বিক্রি করলে সাত রাজার ধনদৌলত পরিমাণ টাকা পাওয়া যাবে। এখন আমার হাতে সাত রাজার ধন। আমি নিজেকে রাজা ভাবতেই পারি। আমি আনন্দে তাতাথৈথৈ তাতাথৈথৈ নৃত্য করতে লাগলাম। নিজেকে বড় সুখী মনে হলো আমার। হবে না? আমি যে এখন পৃথিবীর রাজা!

হঠাৎ আমার মায়ের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি খাটে শুয়ে আছি। আমার হাতের মণিগুলো কই? তাহলে কি পুরো বিষয়টি স্বপ্ন ছিল? আমি কি মাকে স্বপ্নের ঘটনাটা বলব? বলতে পারি? কিন্তু মা তা বিশ্বাস করবে না। শুধু মা কেন, কেউই বিশ্বাস করবে না। থাক, বলে কাজ নেই।

ভাগ্যটা যেন ঘোলা জলের ডোবা ...

কলেজে পড়ার সময় আমার হাতে কিছু বই এলো। বাবা এনে দিল সেই বইগুলো। একটি বইয়ের একগুচ্ছ পঙ্‌ক্তি আমার মনের গতি পাল্টে দিল।

"আমার ভাগ্যটা যেন ঘোলা জলের ডোবা
বড় রকম ইতিহাস ধরে না তার মধ্যে
নিরীহ দিনগুলো ব্যাঙের মতো একঘেয়ে ডাকে
না সেখানে হাঙ্গর-কুমিরের নিমন্ত্রণ না রাজহাঁসের... ।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই পঙ্‌ক্তিগুলোর মতো ঘোলা জলের ডোবা যেন আমার ভাগ্য। ভাগ্যে হাঙ্গর-কুমিরের দংশন পাইনি, পাইনি রাজহাঁসের নিমন্ত্রণ কোনদিন। বড় ঘোলাটে, বড় নিস্তরঙ্গ মনে হয় এজীবন কখনো কখনো।

আমার ভাগ্যে নেই তাই হয়তো ওসব কিছু হতে পারি নি। যাত্রাপালার নায়ক হতে পারলাম না। জাভেদ মিয়াঁদাদ কিংবা সুনীল গাভাস্কারের মতো। উত্তম কুমারের মতো প্রেম করা হলো না সুচিত্রা সেনের সঙ্গে। একি ভাগ্য নিয়ে জন্মেছি। ওসব হওয়া হয়তো আমার ভাগ্যে নেই। কিন্তু এর জন্য তো জীবন থেমে থাকতে পারে না। চলতি জীবনে যদি কখনো কোন ছেদ পড়ে সেটা চালু

রাখার জন্য অন্য কোন উপায় খুঁজে নিতে হয়। পথ চলতে গেলে যেমন ট্রেন না পেলে বাস, বাস না পেলে সিএনজি কিংবা রিকশায় চড়ে হলেও গন্তব্যে যেতে হয়, তেমনি জীবনে যাত্রাপালার নায়ক, জাভেদ মিয়াঁদাদের মতো ক্রিকেট খেলোয়াড় কিংবা উত্তম কুমারের মতো হিরো হতে না পারলেও জীবন থেমে থাকতে পারে না। জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় আশা দিয়ে, স্বপ্ন দিয়ে। আমি তাই স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। সত্যি বলছি, একেবারে সত্যি, মিথ্যে নয়। শৈশব-কৈশোর থেকেই আমার স্বপ্ন দেখার অভ্যেস ছিল। অনেক বড় বড় স্বপ্ন আমি দেখেছি আশৈশব। স্বপ্ন দেখেছি রাজা হওয়ার। এর চেয়ে বড় স্বপ্ন আর কী হতে পারে? শৈশবের সেই স্বপ্ন কৈশোরে এসে রঙ বদলে নিলাম। স্বপ্নের বাড়তি জৌলুসটা ছেটে ফেললাম বাস্তব বাদী হয়ে তরুণ বয়সে। তাই রাজা হওয়ার আকাশকুসুম কল্পনা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে বড়লোক হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হলাম। বি.এ পাস করেছি। জানি, এতে বড়জোর মাস্টারি কিংবা কেরানির চাকরি ছাড়া কিছুই মিলবে না। তাও মিলবে যদি ভাগ্যে থাকে। অবশ্য এ দেশে মেধা, লোক ও টাকা এই তিনটি খুঁটির দুটি যার আছে, চাকুরি পাওয়ার ক্ষেত্রে সেই অগ্রগামী। এ তিনটি খুঁটির একটি খুঁটি মাত্র আমার আছে। কিন্তু এতে কোন লাভ নেই। কারণ মেধা আজকাল কাজে লাগে না। কাজে লাগায় না কেউ।

আমি বড়লোক হওয়ার আশায় সর্বক্ষণ নিমগ্ন। কীভাবে বড়লোক হওয়া যায় সেই উপায় খুঁজতে লাগলাম। তখন আমার মনে হলো, বড়লোক হতে হলে আমাকে বিদেশ যেতে হবে। বিদেশই হচ্ছে টাকা-পয়সা উপার্জনের মোক্ষম জায়গা। বিদেশ যেতে না পারলে আমার বড়লোক হওয়া যাবে না। কোন মতে বিদেশের মাটিতে পা রাখতে পারলেই আমার ইচ্ছে পূরণ হবে।

বিদেশ যাবার কথা জানালাম আমার বাবাকে। বাবা প্রথমে কিছুটা আপত্তি করলেও পরে রাজি হলো। কিন্তু আমার মা কিছুতেই রাজি হতে চাইল না। মাকে অনেক বুঝিয়ে রাজি করালাম। শেষ পর্যন্ত আমার বিদেশ যাবার ব্যাপারে মা-বাবার দু'জনের সম্মতি পেলাম। আমার বাবা-মা দু'জনেই অতি সাধারণ মানুষ। আমার কাছে তাদের চাওয়া ছিল অতি অল্প। বিদেশ গিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পাঠিয়ে তাদের সুখী করব এমনটা কখনোই চাওয়া ছিলো না তাঁদের। আমার বাবা প্রায় পঁচিশ বছর গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করেছে। বাবার খুব ইচ্ছে ছিল, আমি লেখাপড়া করে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করব। নামের শেষে অর্জন করব এম. এ ডিগ্রি। বেশি কিছু না হোক অন্তত কলেজে পড়াব। বাবার ইচ্ছের সঙ্গে মিলিয়ে আমি নিজেও স্বপ্ন দেখতাম এরকম। কিন্তু মানুষ যা চায় তা কি সবক্ষেত্রে পায়? কখনো কখনো মানুষ চায় একরকম, হয়ে যায়

অন্যরকম। চরম এই সত্যি কথাগুলো বুঝতে বুঝতে জীবনে আমার তিরিশ বছর পার হলো।

আমাকে বিদেশ পাঠিয়ে বাবার স্বপ্নটা পূরণ হল না বলে বাবা মনে মনে বেশ নিরাশ হলো। প্রত্যেক বাবা-মাই তাদের সন্তানকে লালন করার সাথে সাথে তাদের সন্তানকে নিয়ে দেখা স্বপ্নটাকেও লালন করে। আমার বাবার স্বপ্ন আমি পূরণ করতে পারিনি। এ আমার ব্যর্থতা, অক্ষমতা নয়।

বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন বুকে লালন করে সৌদিআরবে পাড়ি দিলাম। কিন্তু আরবী ভাষার ঐ দেশটাতে যে আগুনের মতো রোদ আগে তা জানিনি কখনো। সৌদি আরব খুব সুন্দর দেশ। আমাদের নবীজির জন্মভূমি আর কা'বা ঘর যেখানে অবস্থিত সেই দেশটা তো সুন্দর হবেই। সারি সারি খেজুর গাছ ও বালুময় মরুভূমি সমেত সেই দেশটির রাজধানী রিয়াদের একটা মফস্বল এলাকায় আমার স্থান হল। কিন্তু সেখানের রৌদ্রতাপে অস্থির হয়ে পড়লাম ।

আমি মাকে ফোন করে জানালাম, 'মাগো, এখানে রোদ বড় কড়া গো মা। শরীর পুড়ে যায়। মাটিতে খালি পায়ে হাঁটা যায় না।'

মা তখন কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে মা আমাকে বলল, 'বাবা, তুই দেশে ফিরে আয়।'

'দেশে ফিরে আসব?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু চাইলেই যে এখান থেকে ফিরতে পারব না। পাসপোর্ট, ভিসা, টিকেট, ফ্লাইট...।'

'যেভাবেই হোক তুই দেশে ফিরে আয়।'

'দেশে ফিরে এলে কী করে হবে মা? আমি তো টাকা রোজগার করতে এসেছি। আমি যে বড়লোক হতে চাই।'

'পাগলামি রাখ বাবা। তুই বেঁচে না থাকলে...।'

'মা, ওভাবে বলো না। তুমি দোয়া কর যেন আমাকে আল্লাহ সব রকম বিপদ থেকে রক্ষা করে।' মাকে আর বলতে না দিয়ে বললাম আমি।

'সাবধানে থাকিস বাবা। ঠিক মতো খাওয়া-দাওয়া করিস, খুব দুশ্চিন্তায় আছি তোর জন্য।'

মাদের এই দুশ্চিন্তা চিরকালের। সন্তানের জন্য তাঁদের এমন দুশ্চিন্তা কোনকালেই শেষ হবার নয়।

রোদ যত কড়াই হোক আমাকে কাজ করতে হবে। জমাতে হবে টাকা। বাংলাদেশের ফিরিয়ে নেবার জন্য। বড়লোক হবার জন্য। কিন্তু এর জন্য আমাকে কাজ পেতে হবে। কাজ কোথায় পাই? যে লোকের মাধ্যমে এখানে

এলাম সে-ই আমাকে কাজ যোগাড় করে দিল। ফল বিক্রির কাজ। আমি ভীষণ খুশি হলাম। চোখের সামনে ভেসে উঠল টাকা। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকা। যা আমার আজন্মকাল চাওয়া।

আমি কাজ করতে লাগলাম মনেপ্রাণে। কিন্তু প্রচন্ড রোদে উত্তপ্ত বালুময় পথের ওপরে দাঁড়িয়ে ফল বিক্রি করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম কাজটা মোটেও সহজ নয় আমার জন্য। এমনিতেই প্রখর রৌদ্র-তাপের দেশ সৌদিআরব। তার ওপরে প্রায় আটচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপ মাত্রায় সর্বক্ষণ পুড়তে হচ্ছে। এটা খুব অসহ্য বোধ হলো আমার। রোদে যেন গা পুড়ে যায়। রোদে গা পুড়ুক তাতে ক্ষতি নেই। টাকা পেলেই হয়। ঠিক এরকম ভেবে আমি ফল বিক্রির এই কাজটা করতে লাগলাম।

কিন্তু কিছুদিন পার হতেই দেখি রোদে পুড়ে গেছে পুরো শরীর। ফুচকার মতো ফুলে ফুলে উঠেছে শরীরের এখানে ওখানে। রক্ত ঝরে পড়ছে পায়ের তলা ফেটে। ব্যথায় অস্থির হয়ে পড়লাম। আমার পাকিস্তানি রুমমেট মাহমুদ বলল, 'শরীরে ঔষধ দাও। নইলে তো অসুস্থ হয়ে পড়বে। কাজ করবে কী করে?'

সত্যিই তো, অসুস্থ হয়ে পড়লে কী করে কাজ করব? কাজেই যেতে হল ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার ঔষধ দিল। ধীরে ধীরে ক্ষত সারতে লাগল।

আগুন ঝরা রোদে পথের ওপর দাঁড়িয়ে ফল বিক্রির কাজটা আমি ছেড়ে দিলাম। মাহমুদের সহযোগিতায় হোটেলে খাবার তৈরীর কাজ পেলাম ওর সঙ্গে। প্রায় আঠারো ঘণ্টা কাজ করতে হয়। মনে মনে ভাবলাম, তবুও ভালো। ঘরের ভেতরে কাজ করব। রোদের তাপ থেকে তো মুক্তি পেলাম।

কিন্তু কিছুদিন কাজ করার পরে বুঝতে পারলাম রান্না ঘরের বদ্ধ পরিবেশে দীর্ঘ আঠারো ঘণ্টা কাজ করা মোটেও সহজ ব্যাপার নয়। বাইরের রৌদ্রতাপ থেকে মুক্তি পাওয়া গেল বটে। কিন্তু ঘরের ভেতরের দমচাপা আগুনের তাপ যে আরও অসহনীয়, সহ্য করা ভীষণ কষ্টকর। তবুও টাকা রোজগারের জন্য চির কাঙ্গাল এই আমি বড়লোক হবার স্বপ্নে নিমগ্ন হয়ে হোটেলের খাবার তৈরীর এ কাজটা করতে লাগলাম। অবশ্য কাজটা আমার করা হত না। মাহমুদের হয়তো আমার অমন কষ্ট দেখে একটু হলেও মায়া হল আমার প্রতি। সে আমাকে রান্না ঘরের ধোঁয়া উঠা উত্তপ্ত বদ্ধ পরিবেশ থেকে ট্রান্সফার করে থালা-বাসন ধোয়ার কাজে লাগিয়ে দিল। আমি মাহমুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কাজটা করতে লাগলাম। কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার অসুস্থ হয়ে পড়লাম। দিনরাত থালা-বাসন ধোয়ধুয়ির ফলে হাতে আমার ঘাঁ হল। ব্যথায় অস্থির হয়ে পড়লাম আমি। তবে কাজটা ছাড়লাম না। করে যেতে লাগলাম ঠিকমত। কাজ করে বাসায় ফিরে দেখলাম খাবার নেই। কাজেই হাতে ঘাঁ নিয়েই রান্না করতে হল। কারণ

এখানে তো মা নেই। রান্না করে রাখবে কে? তখনই বারবার আমার মায়ের কথা মনে পড়ল। আমার একটু জ্বর হলেই মা আমার বিছানার পাশে রাত জেগে বসে থাকত। আজ আমি প্রচন্ড জ্বর ও হাতে ঘাঁয়ের ব্যথায় কোঁকাচ্ছি, এখন আমার মা কোথায়? নিজেকে তখন বড় অসহায়, বড় নিঃস্ব মনে হল। মনে মনে বললাম, 'ধ্যাত, বিদেশে এসে ভুলই করেছি!'

আমার ব্যাথায় কোঁকানো দেখে মাহমুদের হয়তো আবার আমার প্রতি মায়া হলো। সে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে ঔষধপথ্য এনে দিল। সেগুলো খেয়ে আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে আবার কাজ করতে লাগলাম।

এভাবে একদিন দুইদিন এক মাস দুই মাস এক বছর দুই বছর করে দীর্ঘ সাতটি বছর কাটিয়ে দিলাম। সাত বছর পর আমি দেশে ফিরে এলাম। দেশে ফিরে এলাম বটে। কিন্তু আমি যে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে বিদেশ গিয়েছিলাম তার কী হল? কিছুই হল না। আজ আমার সঞ্চয় বলতে কিছুই নেই। সাত বছরে যা রোজগার করেছি আগেই তা দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন আমার সঞ্চয় বলতে কিছু না থাকলেও কোন আক্ষেপ নেই। আমি তো আবার আমার দেশে ফিরে আসতে পেরেছি। ফিরে আসতে পেরেছি আমার মায়ের কাছে। এর চেয়ে আর কী চাওয়ার থাকতে পারে আমার? আটচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস রৌদ্রে তাপের সেই ভয়াবহ স্মৃতি আমি আরব সাগরের অতল জলে ডুবিয়ে দিয়ে এসেছি। আজ আমার অনেকদিনের চেনা, চির আপন, পরম প্রিয় জন্মভূমির মাটিতে পা রেখেই পুরনো সেই ইচ্ছেটা আবার আমার মনের মাঝে জেগে উঠল, 'আমি যদি রাজা হতাম...।'

কাঁধে ব্যাগ আর হাতে ব্রীফকেস নিয়ে রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে রইলাম অনেক্ষণ। একসময় ট্রেন এলো। আমি ট্রেনে উঠে জানলার পাশে বসলাম। কিছুক্ষণ পরেই ট্রেন চলতে শুরু করল।

আমি দীর্ঘ সাত বছর পর আজ দেশে ফিরে এসেছি। ট্রেনে বসে আমি মনে মনে ভীষণ অস্থির হয়ে পড়লাম। কখন ট্রেন স্টেশনে পৌঁছাবে? আমার মাকে দেখবো, বাবাকে দেখব, দেখব ছোটবোন রিতাকে।

ট্রেন অবিরাম ছুটে চলেছে।

সত্যিই যদি আমি রাজা হতাম, আমি যদি রাজা হতামই তাহলে আমার মা কী রকম সুখী হত? আমার মা হত রাজার মা আর আমার বাবা হত রাজার বাবা। আজ এতদিন পরেও আমার রাজা হওয়ার সাধ গেল না। যখন আমি সৌদী আরবের আটচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস রৌদ্রতাপের মধ্যে কাজ করতাম তখন বাংলাদেশ থেকে বুকে লালন করে নিয়ে যাওয়া আমার রাজা হওয়ার

ইচ্ছেটা সৌদিআরবের মরু লো হওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে সারাক্ষণ গুনগুন করে গাইতাম সেই গানটি–

"চাই না মাগো রাজা হতে
রাজা হবার সাধ নাই মাগো,
দুবেলা যেন পাই শুধু খেতে।"

হৃদয় কাননে ফুল ফুটাও ...

হঠাৎ ট্রেন থেমে গেল। কখন যে সখীপুর স্টেশনে পৌছে গেছি আমি তা টের পাই নি। সখীপুর স্টেশনে মিনিট দশেক অপেক্ষা করতে হবে। এখান থেকে যাত্রী উঠছে ট্রেনে। ট্রেন থেকেও নামছে। আমি জানালার পাশে চুপচাপ বসেছিলাম এতক্ষণ। বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, পুরো প্লাটফর্মে মানুষের ভিড় জমে আছে।

ট্রেনে বসে এক ঘেয়ে ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে শুনতে ভীষণ বিরক্ত বোধ হল আমার। মনে হল ট্রেনটা এখন ছেড়ে গেলেই বাঁচি। কিন্তু ট্রেনটা ছাড়ল না। আমি ভাবলাম, কিছু খেয়ে নেয়া যাক। কী খাওয়া যায়? হাঁসের ডিম, পানসে চা আর নোনতা বিস্কুট ছাড়া ট্রেনে আর কিছুই নেই। এসব কি খাওয়া যায়?

আমি ট্রেন থেকে নেমে এলাম।

একটা ঝুপড়ির মতো দোকানে একজন মাঝবয়েসী লোক বসে সমুচা, সিঙ্গারা আর চা বিক্রি করছে। আমি এককাপ চা আর দুটো সিঙ্গারা খেয়ে নিলাম। এর পরেই আমাদের কুসুমপুর রেলস্টেশন। সেখানে পৌছাতে আরও এক ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। মাত্র এক ঘণ্টা পরেই আমি আমার মায়ের হাতের রান্না করা খাবার খেতে পারব। দীর্ঘ সাত বছর ধরে খাই না মায়ের হাতের রান্না করা ওসব সুস্বাদু খাবার। আমার মায়ের হাতে রান্না করা খাবারের যে স্বাদ পৃথিবীর কোনো রেস্টুরেন্টের খাবার কি সে রকম স্বাদ আছে? আমার মায়ের হাতের রান্না করা খাবার খেয়ে আমি যেরকম তৃপ্তি পাই, পৃথিবীর কোন রেস্টুরেন্টের খাবারে সেরকম তৃপ্তি পাব?

আমি চা সিঙ্গারা খেতে না খেতেই ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে এলো। বারবার বাঁশি বেজে উঠল ট্রেনে। আমি ট্রেনে উঠার জন্য ছুটলাম।

'এক্সকিউজ মি!'

হঠাৎ এ সময়ে পেছন থেকে একটা মেয়ের গলা শোনে থমকে দাঁড়ালাম।

মেয়ের গলাটা ভেসে এলো আমার পেছন থেকে। আমি অকস্মাৎ পেছনে ফিরে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। আমি দেখতে পেলাম একজন মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটার পরনে শাড়ি, নীল রঙের। এ শাড়িতে বেশ সুন্দর লাগছে মেয়েটাকে। ওর চুলগুলো উড়ছে বাতাসে। ওর কপালে লাল টিপ পরা। টিপটা দেখে মনে হল, ওর প্রশস্ত কপালে সকালের লাল সূর্য উদয় হয়েছে। মেয়েটার নাম রুবা। আমি দেখেই চিনে ফেললাম ওকে। চিনতে একটু ও ভুল হলো না আমার। ভুল হবেই বা কেন? ও যে বহু দিনে মুখস্ত করা প্রিয় কোন কবিতার মতো আমার মন, মননে গেঁথে আছে চির অম্লান হয়ে। ওকে কি কখনো ভুলতে পারি? না ভোলা যায়?

রুবাকে আগে কখনো আমি এ রকম বেশে দেখি নি। আজ দেখলাম। ওকে দেখে চমকে উঠার এটাই কারণ আমার। শুধু কি চমকে উঠলাম? "থমকে গেল আমার সমস্ত মনটা, চেনা লোককে দেখলাম অচেনার গাম্ভীর্যে... ।"

রুবার সঙ্গে কতদিন পরে আজ আমার দেখা হল? ঠিক হিসেব করলে দেখা যাবে প্রায় দশ বছর পরে ওর সঙ্গে আমার দেখা হল আজ। শেষবার যে দেখা হয়েছিল সেটা অনেক দিন আগে। তখন আমার কলেজের করিডোরে, ক্যাম্পাসে সর্বদা বিচরণ ছিল।

রুবার সঙ্গে আমার শেষবার দেখা হয়েছিল সেটা কতদিন আগে? সঠিক হিসেব জানা সম্ভব নয়। সম্ভব হবেই বা কেন? ওর সঙ্গে শেষ দেখা হবার পর পৃথিবী ও মহাকাল তো থেমে নেই। বদলে গেছে সময় ও কাল। বদলে গেছি আমি, বদলে গেছে রুবা। বদলে গেছে সবকিছুই। শুধু বদলে যায়নি রুবার সঙ্গে আমার সেসব দিনের স্মৃতিগুলো। সেই যে... । না, সেই গল্পটা আমি কোনদিন কাউকে বলব না। আমার বুকের বুক সেল্‌ফে সাজিয়ে রাখব অনন্ত কাল। যেভাবে রেখেছি এতটা বছর। কাউকে বলব না, কাউকেই না। কারণ গল্পটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত গল্প, আমার ভালোবাসার গল্প।

আমি কিছু বলার আগেই রুবা বলল, 'কেমন আছো জাহিদ?'

'ভালো। তুমি এখানে কেন?'

'কিছুদিন হল এখানে বদলি হয়ে এলাম। ওই তো স্টেশনের পাশেই সখীপুর প্রাইমারি স্কুল। ওখানে জয়েন করেছি।'

রুবা হাতের ইশারায় রেলস্টেশনের অদূরে একটা স্কুল দেখাল। আমি বুঝতে পারলাম রুবা এখন স্কুলের টিচার। বেশ উন্নতি হয়েছে রুবার। বিয়ের পরেও কি রুবা পড়াশোনা করেছিল?

হয়তোবা।

ট্রেন থেকে বারবার বাঁশি বেজে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেন ছেড়ে দেবে। স্টেশনের মানুষের ভিড়টা এখন আর নেই। প্রায় সবাই উঠে পড়েছে ট্রেনে। এখনই আমাকে ট্রেনে গিয়ে উঠতে হবে। নইলে ট্রেন আমাকে ফেলেই চলে যাবে।

আমি রুবাকে আর কিছু না বলে ট্রেনের দরজার দিকে ছুটে চললাম। রুবা আমাকে পেছন থেকে ডাকল। আমি ওর ডাকে সাড়া দিলাম না। ফিরেও তাকালাম না একবার। ফিরে তাকাবার কি কোন মানে আছে? "সময় কোথায় সময় নষ্ট করার, আমাকে নামতে হবে পরের স্টেশনেই... ।"

আমি ট্রেনে উঠে পড়লাম। জানালা দিয়ে একবার দেখলাম রুবাকে। ও অনিমেষ চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। "যেন কাছের দিনের ছোঁয়া-পার-হওয়া-চাহনিতে... ।"

ট্রেন চলতে শুরু করল।

আমি আরেকবার দেখলাম রুবাকে। ও আগের মতোই তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি মনে মনে বললাম, 'ভালো থেকো রুবা।'

ট্রেনের একঘেয়ে ইঞ্জিনের শব্দে বিরক্ত বোধ হচ্ছিল বলে আমি ট্রেন থেকে নেমে এসেছিলাম। কিন্তু নেমে কী পেলাম? অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে রুবার সঙ্গে দেখা, বুকের গহীনে চিনচিনে ব্যথা আর রাশি রাশি দীর্ঘশ্বাস... ।

আহ! কী যে সুখ ছিল হারানো সেই দিনগুলোতে! বুকের ভেতরে এখনো বোবা কান্না গুমরে উঠে হারানো সেই দিনগুলোর কথা মনে হলে। "হায় আর কি কোথাও ফিরে পাব সে জীবন...!"

রুবার সঙ্গে এতটা দিন, এতটা বছর পর আজ আমার কেন দেখা হল? আমি তো এতদিন সেসব স্মৃতি ভুলেই ছিলাম। ভুলে ছিলাম বটে। কিন্তু একেবারে ভুলে যাইনি। তাই তো ওকে দেখেই হারানো সেই দিনগুলির কথা মনে পড়ে গেল।

রুবাকে নিয়ে আমার যে একটা গল্প আছে, যা আমি কাউকে কোনদিন বলিনি। বুকের বুক সেল্‌ফে সাজিয়ে রেখেছিলাম এতকাল। আমার মনে হয়, সেই গল্পটা এখন বলে ফেলা যায়। কী এমন বিশেষত্ব আছে যে গল্পটা গোপন রাখতে হবে। রুবার সঙ্গে আমার কী রকম সম্পর্ক ছিল সেটা জানিয়ে রাখা দরকার। তাছাড়া গল্পটা তো রূপকথার মিথ্যে গল্প নয়।

যাক, গল্পটা বলেই ফেলি।

রুবার সঙ্গে যে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল ঠিক কখন, তা সঠিক মনে নেই বলে গল্পটা শুরু করতে কিছুটা বিব্রত হতে হচ্ছে আমাকে। সত্যিই, সেই দিনটি কত তারিখ ছিল? বার কী ছিল? কিছুই মনে পড়ছে না।

আচ্ছা, গল্পটা এভাবে শুরু করি।

তখন আমি শুশুন্ডা গ্রামে থাকতাম। পড়তাম মফস্বলের একটি কলেজে। ইন্টারমিডিয়েট ফাস্ট ইয়ারে। সেটা ১৯৯৯ সালের কথা...।

ক্লাশরুমে প্রথম দেখা হয়েছিল রুবার সঙ্গে আমার। প্রথম দেখাতেই ওকে আমার ভালো লাগল। মনে আছে ওকে প্রথম দেখা মাত্র আমার বুকের গহীনে একটা কাঁপন উঠেছিল। পলকহীন চোখে আমি তাকিয়ে ছিলাম ওর মুখের দিকে। তাকিয়ে ছিল সেও আমার মুখে। অপলক ও নির্লিপ্ত ছিল সেই চাওয়া।

রুবা ও আমার ভালো লাগার গল্পটা শুরু হয়েছিল এভাবেই।

শুশুন্ডা গ্রামটা আমাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে ছিল। এ জন্য বাড়ি থেকে প্রত্যেকদিন কলেজে আসা যাওয়া আমার খুব কষ্টকর ছিল। কাজেই লজিং থাকতে হল আমাকে। কলেজের কাছাকাছি একটা বাড়িতে লজিং এর ব্যবস্থা হল আমার। লজিং বাড়িতে এসে জানতে পারলাম বাড়ির মালিক রুবাদের আত্মীয়। আমি মনে মনে ভীষণ খুশি হলাম। খুশি হলাম এজন্য যে, আত্মীয়তার কারণে রুবা প্রায়ই আমার লজিং বাড়িতে আসত। ক্লাশ, ক্যাম্পাস ছাড়াও রুবাকে দেখার,ওর সঙ্গে কথা বলার এটা আমার বাড়তি সুযোগ ছিল।

একদিন আমি রুবাকে আমার ভালো লাগার কথা জানালাম নিঃসংকোচে। কথাটা আমি নিঃসংকোচে জানালাম বটে। কিন্তু রুবা বেশ সংকোচ করল। সংকোচে ও মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারল না। তখন নিজেকে বড় ছোট মনে হল আমার। কেন ওভাবে বলতে গেলাম আমি? রুবা কী ভাববে!

পরদিন কলেজে গিয়ে দেখাহল রুবার সঙ্গে। আমি ওকে দেখে সম্মুখ থেকে পালাতে চাইলাম। কিন্তু রুবা তা হতে দিল না। ও আমার সামনে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে কলেজের ডায়েরিটা বুকের ওপরে দু'হাতে চেপে ধরে আমাকে বলল, 'জাহিদ, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

আমি নির্বিকার গলায় বললাম, 'কী কথা, বলো?'

'কথাগুলো এখানে বলা যাবে না।'

'এখানে বলা যাবে না?'

'না।'

'কোথায় বলা যাবে?'

'তুমি কি আজ বিকেলে একটু আমাদের বাসায় আসতে পারবে?'

'হ্যাঁ, পারব।' একটু ভেবে নিয়ে বললাম আমি।

'ঠিক আছে, বিকেলে বাসায় এসো, ওখানে বলব। আসবে তো?'

'আসব।'

বিকেলে আমি রুবার বাসায় গেলাম।

কলিংবেল চাপতেই একটা মেয়ে দরজা খুলে দিল। মেয়েটাকে এক পলক দেখেই আমি ওর দেহের সৌষ্ঠব নিরীক্ষণ করে নিলাম। সাধারণ মেয়েদের তুলনায় একটু লম্বাটে। দীঘল কালো চুল পিঠের ওপরে ছড়ানো। পানপাতার মতো মুখের আকৃতি। কালো চোখের ওপরে সাদা ফ্রেমের চশমা মুখের সৌন্দর্য্য বাড়িয়েছে দ্বিগুন। প্রজাপতির মতো বর্ণিল বাহুজোড়া মেলে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে।

আমি কিছু বলার আগেই মেয়েটা আমাকে বলল, 'কাকে চান?'

আমি বললাম, 'এটা রুবাদের বাসা, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'রুবা কি বাসায় আছে?'

'হ্যাঁ। আপু বাসায় আছে। আপনি ভেতরে আসুন।'

বুঝতে পারলাম মেয়েটা রুবার ছোটবোন।

আমি ঘরের ভেতরে ঢুকলাম।

মেয়েটা আমাকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনি এখানে বসুন। আমি আপুকে ডেকে দিচ্ছি।'

মেয়েটা ভেতরে চলে গেল। আমি চেয়ারে গিয়ে বসলাম।

কিছুক্ষণ পরে রুবা এলো। এসে আমার পাশে আরেকটা খালি চেয়ারে বসল। বসেই ও আমার দিকে তাকাল। ও এমনভাবে তাকাল যে আমি লক্ষ্য করলাম, ওর চাওয়ার মাঝে একটা অদ্ভুত ভাষা ফুটে উঠেছে। যা পড়লে অর্থ দাঁড়ায় এ রকমঃ

"ধীরে ধীরে প্রাণে আমার এসো হে,
মধুর হাসিয়ে ভালোবেসো হে।
হৃদয় কাননে ফুল ফুটাও
আধো নয়নে, সখি চাও চাও-
পরাণ কাঁদিয়ে দিয়ে
হাসিখানি হেসো হে।"

রুবা নিষ্পলকভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমাকে বলল, 'জাহিদ, আমি তোমার কাছে একটা কথা জানতে চাইব। আমি যা জানতে চাইব তুমি তার ঠিক ঠিক জবাব দেবে। দেবে, বলো?'

আমি শান্ত গলায় বললাম, 'দেব।'

রুবা বলল, 'তুমি কি আমার প্রতি অনুরাগ অনুভব কর। আমি বলতে যাচ্ছি- তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?'

আমি রুবার কথামতো ঠিক ঠিক জবাব দিলাম। বললাম, 'হ্যাঁ। আমি তোমাকে ভালবাসি।'

রুবা ও আমার ভালোবাসার গল্পটা শুরু হয়েছিল এভাবেই।

কীভাবে রুবা আমার জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল এবার সেই গল্পটা বলি।

তখন আমরা দু'জন মিলে স্বপ্ন দেখতাম। আমাদের স্বপ্ন ছিল অদ্ভুত ও অলীক। স্বপ্ন দেখতাম একটি সুখের ঘর বাঁধার। মাঝে মাঝে মনে হত, আমাদের এই স্বপ্ন ভেঙ্গে যাবে না তো? রুবা কখনো হারিয়ে যাবে না তো আমার জীবন থেকে? কিন্তু এই ভয়টাই সত্যি হল। "হঠাৎ একদিন গুজব গেল শোনা, এই বাড়িতে ঘটক করে আনাগোনা... ।"

অনেক জায়গা থেকে রুবার বিয়ের প্রস্তাব আসা শুরু হল। রুবার বাবাও ব্যস্ত হয়ে পড়ল মেয়েকে পাত্রের হাতে তুলে দিতে। কেননা, মেয়ের বয়স বাড়ছে। মফস্বলে মেয়েদের বয়স আঠারো পেরোনোর আগেই চারপাশের লোকজন নানা কথা বলাবলি শুরু করে। অবশ্য বয়সের তুলনায় রুবার দেহের গঠন একটু বেশি বেড়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সৌন্দর্য্য ও ফুটে উঠেছিল ওর দেহে। এ জন্য বিয়ের প্রস্তাবের হিড়িক পড়ে গেল রুবার। তখন আমার কিছুই করার ছিল না। কিছু করা মানে রুবাকে বিয়ে করা। সেই কারণে আমি ইচ্ছে করেই রুবার সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ থেকে বিরত রইলাম।

হঠাৎ একদিন বিয়ে হয়ে গেল রুবার। সত্যি, সত্যি, সত্যি, একেবারে তিন সত্যি করে বলছি। রুবার বিয়ে হয়ে যাওয়াটা আমি তখন একটু সিরিয়াস ভাবি নি। দৈব বলে হয়তো সবকিছু মেনে নেয়ার শক্তি অর্জন করেছিলাম। আমি কিন্তু সৌদী আরবের দুঃসহ সেই পরবাসে এসব কথা মোটেও ভাবিনি। এমনকি মনেও পড়েনি আমার। আজ সখীপুর স্টেশনে অনেকদিন পরে রুবাকে দেখে আমার সেসব কথা মনে পড়ল। রুবাকে দেখে ওকে ঘিরে আমার যে স্মৃতি, কখনো হারায়নি বিস্মৃতির অতলে, সেই স্মৃতির খেয়া বেয়ে আমি ফিরে গেলাম ফেলে আসা সেই দিনগুলোতে। মনে হল, আজও আমি থেমে আছি সেখানে- যেখানে স্মৃতির দুয়ার খোলে অতীত পিছু ডাকে । ফেলে আসা দিনগুলোতে ফিরে যেতে পারি আমি মনের খেয়া বেয়ে বটে। কিন্তু সেই দিনগুলি কি আর

ফিরে পাব? ফিরে কি পাব আমি রুবাকে আর কখনো? জানি, পাব না। মাথা ঠুকলেও আমি পাব না রুবাকে ফিরে । কারণ, রুবা অন্য জনের একান্ত একান্তে একাত্ম এখন।

রুবাকে নিয়ে আমার যে অজানা একটা গল্প ছিল, সেটাতো জানিয়ে দিলাম। তাই বলে কি রুবাকে নিয়ে আমার গল্পটা ফুরিয়ে যাবে, থেমে যাবে? না, কখনোই না। "নটে শাকটি মুড়ায় না, সব গল্প ফুরায় না। কোনো কোনো গল্প আছে চলবে চিরকাল... ।"

ঘটনাটা ঘটেছিল রাতে ...

হঠাৎ থেমে গেল ট্রেনটা। ট্রেনের ভেতরে যারা ছিল সবাই একটু নড়েচড়ে উঠল। নামতে শুরু করল কেউ কেউ। আমি জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম, কুসুমপুর স্টেশনে পৌঁছে গেছে ট্রেন। রুবার গল্প বলতে বলতে কখন যে ট্রেনটা এখানে পৌঁছে গেছে একদম টের পাই নি।

আমি ট্রেন থেকে নামলাম।

কুসুমপুর রেলস্টেশনে তেমন কোন বৃক্ষরাজি নেই। নেই রাঙ্গা মাটির পাহাড়ও। আকাশে উড়ে না এখানে সারি সারি বাঁলিহাস। তবে দক্ষিণের খোলা বাতাস আছে। সেটাই এখন লাগল আমার শরীরে। এ মুহূর্তে আমার মনে আনন্দের সীমা নেই। একটু পরেই আমি আমার বাড়িতে পৌঁছাব। সাতবছর পরে নিজের বাড়িতে, নিজের আত্মীয় স্বজনের কাছে পৌঁছাতে পারা যে কী রকম আনন্দের হতে পারে আমি ছাড়া কেউ তা বুঝবে না।

স্টেশনে অনেকগুলো রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকজন রিকশা নিয়ে এগিয়ে এলো আমাকে নেওয়ার জন্য। আমি একটা রিকশায় উঠে পড়লাম।

আমাদের বাড়িটা কুসুমপুর গ্রামের একবারে পূর্ব মাথায়। খানিকক্ষণ রিকশা চড়তে হবে। রিকশা বেশ দ্রুত বেগে ছুটে চলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো আমি বাড়িতে পৌঁছে যাব।

এই পথ আমার অচেনা নয়, চেনা। চির চেনা এপথের প্রতিটি ধূলিকণাও আমাকে চেনে। কতদিন এই পথে আমি হেঁটেছি! এই পথে হেঁটে হেঁটে কেটেছে আমার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের প্রায় পুরোটা সময়। সেই শৈশবে এই পথে আমি স্কুলে যেতাম। তখন এই পথে শিউলি ফুল ঝরে পড়ে থাকতো। আমি

রাশি রাশি শিউলি ফুল কুড়িয়ে মালা বানিয়ে বন্ধুদের উপহার দিতাম। আজ মনে পড়ছে সেই শিউলি ফুলের স্মৃতি।

"শিউলি ফুলের রাশি শিশিরের আঘাত ও সয়না
অন্তত আমার কৈশোরে তারা এ রকমই ছিল
এখন শিউলি ফুলের খবর ও রাখি না অবশ্য.
জানি না, তারা স্বভাব বদলেছে কিনা।
আমার কৈশোরে শিউলি বোঁটার রং ছিল শুধু
শিউলি বোঁটার মতন
কোনো কিছুর সঙ্গেই তার তুলনা চলে না
আমার কৈশোরে পথের ওপরে ঝরে পড়ে থাকা
শিশির মাখা শিউলির ওপরে পা ফেললে পাপ হতো
আমরা পাপ কাটাবার জন্য প্রণাম করতাম।
আমার কৈশোরে শিউলির সম্মানে
সরে যেত বৃষ্টিময় মেঘ
তখন রোদ্দুর ছিল তাপহীন, উজ্জ্বল
দু'হাত ভরে শিউলির ঘ্রাণ নিতে মনে হতো
আমার কোনো গোপন দুঃখ নেই,
আমার হৃদয়ে কোন দাগ নেই।
অন্তত এ রকমই ছিল আমার কৈশোরে
এখন অবশ্য শিউলি ফুলের খবর ও রাখি না।"

আমার কৈশোরের শিউলিঝরা এই পথটা আগে পাকা ছিল না। এখন পাকা করা হয়েছে। সাত বছর পরে এই পথে হাঁটতে গিয়ে এই পরিবর্তন টুকু আমি দেখতে পেলাম।

স্টেশন পেরিয়ে কুসুমপুর বাজারের ওপর দিয়ে ছুটে চলল রিকশাটা। বাজারে অনেক লোকজন। সবাই অন্য রকম চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে। মনে হয় যেন আমি এই এলাকায় আজ নতুন এসেছি ।

ছোটবেলায় আমার বাবার সঙ্গে এই বাজারে আসতাম আমি। বুধবার ছিল হাট বসার দিন। তখন হাজার হাজার মানুষ এখানে জমা হতো। এত মানুষ আমি আগে কখনও দেখিনি। আমি বাবাকে তাই বলেছিলাম, 'বাবা, বাজারে এতো মানুষ, ওরা রাতে কোথায় ঘুমায়?'

আমার কথা শোনে বাবা ভীষণ হেসেছিল সেদিন। আমি বুঝিনি বাবা আমার কথা শোনে কেন হেসেছিল? কী অবুঝইনা ছিলাম তখন!

আমার রিকশাটা বাজার পেরিয়ে এলো। গ্রামের পাশের রাস্তা দিয়ে অবিরাম গতিতে ছুটে চলছে রিকশাটা। হঠাৎ আমি লক্ষ্য করলাম, আমাদের গ্রামের প্রধান মাতব্বর মোসলেম তালুকদারকে। বাজারের দিকে হেঁটে যাচ্ছিল সে।

আমাকে দেখে মোসলেম তালুকদার বলল, 'কে, জাহিদ বুঝি?'

আমি বললাম, 'জ্বী কাকা।'

'আজই কি বিদেশ থেকে ফিরেছ?'

'হ্যাঁ কাকা। আজই ফিরলাম।'

'কেমন আছ তুমি?'

'ভালো। আপনারা কেমন আছেন, ভালো তো?'

'ভালোই।'

রিকশাটা মোসলেম তালুকদারকে ছাড়িয়ে চলে এলো। তাই আর কোন কথা বলা সম্ভব হল না ওর সঙ্গে।

মোসলেম তালুকদার। তালুকদার বটে। এই তালুকদারির মাঝে ও নিজস্ব একটা জগত আছে তার। সেই জগতের রাজা, মহারাজা, রাজাধিরাজ শুধু মোসলেম তালুকদার। জগতটা এক দিন, দুই দিন বা এক বছর দুই বছরের সৃষ্টি নয়। দীর্ঘ চল্লিশ বছরে তিলে তিলে গড়ে তোলা। চল্লিশ বছর আগে ঠিক আজকের এই জগতটার জন্যেই অপেক্ষা করছিল সে। তখন মোসলেম তালুকদার ছিল কেবলই আক্ষরিক অর্থে তালুকদার। সত্যিকারে তালুকদার হতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে তাকে।

আজ মোসলেম তালুকদারের জীবন ধন্য। স্বার্থক তার নামের আগে তালুকদার উপাধি। এখন দিনরাত প্রতিটি প্রহরই তার কাছে মনে হয় হিরন্ময়, প্রতিটি দিনকে মনে হয় সুন্দর। প্রতিটি রাতকে মনে হয় নিকানো উঠানে বসে বাঁশ বাগানের মাথার ওপরে সিলভারের থালার মতো পূর্ণিমার চাঁদ দেখে দেখে জীবনানন্দ দাস কিংবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা পড়ার প্রিয় মুহূর্ত। মোসলেম তালুকদার জীবনানন্দ দাস কিংবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা জানে না। এ জন্যই হয়তো কিংবা পুরনো অভ্যেস ভুলতে পারেনি বলেই কিনা এখনো সে মনে মনে গুন গুন করে উচ্চারণ করে সেই বাক্যটি- "পাকসার জমিন শারবাদ!"

হায়রে রাজাকার! সেই যে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের বছর, মোসলেম তালুকদারের ভাষায় গন্ডগোলের বছর। তখন সে ছিল শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান। পাকবাহিনীকে সাহায্য করেছে মনেপ্রাণে। ওদের হাতে তুলে দিয়েছে গ্রামের অনেক মেয়েকে। জানিয়ে দিয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন আস্ত

়নার খবরও। বিনিময়ে পাকহানাদারের কাছ থেকে পেয়েছে টাকাপয়সা। ওদের বলে বলিয়ান হয়ে জোর করে কেড়ে নিয়েছে অন্যের সম্পত্তি। কেটে নিয়েছে ক্ষেতের ফসল। নিজে কোন চাষ করেনি। অথচ ফসলে গোলা ভরে তুলেছে। '৭১ এর যুদ্ধে বাঙ্গালীর বিজয় হওয়ার পরে কিছুদিন নীরব ছিল মোসলেম তালুকদার। এত জঘন্য যুদ্ধাপরাধী হয়েও কীভাবে যেন বেঁচে গেল সে। এসব কথা আমি জানতাম না। তবে আমার বাবার মুখে শুনেছি। আর জানবই বা কী করে? আমি তো তখন এ পৃথিবীর কেউ ছিলাম না। আমি জন্মেছি মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার আরও ছয় বছর পরে। আমি যখন থেকে হাঁটতে শিখেছি, শিখেছি কথা বলতে তখন থেকেই দেখে আসছি এই মোসলেম তালুকদার আমাদের গ্রামের প্রধান মাতব্বর। মাতব্বর হিসেবে সে কি দাপট তার। কেউ তার বিরুদ্ধে টু শব্দটিও উচ্চারণ করতে পারে না। দৈবাৎ কেউ তার বিরোধাচরণ করলে সে তার জমিতে খাল কেটে নিজের সম্পত্তি বাড়ায়। একবার কেউ ওর কথার পিঠে কথাও যদি বলে তাকে কাঁচাকলা দেখিয়ে তবে ক্ষ্যান্ত হয়।

কিন্তু ৭১ এ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় সে যে রকম অপরাধ করেছে তার শাস্তি হওয়া চাই। শাস্তি হবে মোসলেম তালুকদারের? তবেই হয়েছে! শাস্তি টা দেবে কে?

আমি আর আমার বন্ধু শাহেদ সুযোগ খুঁজতে লাগলাম। যেভাবেই হোক ওকে জব্দ আমরা করবই। হঠাৎ একটা সুযোগ মিলে গেল। শুধু সুযোগই না, বলা যায় সুবর্ণ সুযোগ একটা পেয়ে গেলাম আমরা।

শাহেদ নিজেদের জমিতে মাটি কুপিয়ে মিষ্টিআলু তুলছিল। হঠাৎ কোদালের কোপে একটা শব্দ হল। শাহেদ মাটি সরিয়ে দেখতে পেল একটা মানুষের হাঁড়। সে ভাবল, এখানে আরও হাঁড় থাকতে পারে।

শাহেদ কোদাল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে হাঁড় খুঁজতে লাগল। অনেক খোঁড়াখুঁড়ি করে দেখা গেল পাঁচ সাতটি মানুষের মাথার খুলি ও অনেকগুলো হাঁড় পড়ে আছে মাটির নিচে। শাহেদ এসব হাঁড়গোড় দেখে একটু ভয় পেলেও নিজেকে সামলে নিল। কারণ এগুলো কোন ভূত-প্রেতের হাঁড় নয়। এগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের হাঁড়। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনী হয়তো ওদের মেরে এখানে মাটি চাপা দিয়ে রেখেছিল।

শাহেদ ব্যাপারটা গ্রামের সবার কাছে প্রচার করতে লাগল। সবাই ছুটে এলো মুক্তিযোদ্ধাদের এসব হাঁড় ও মাথার খুলি দেখতে। গ্রামের সবাই যখন ব্যাপারটা জানলো তখন মোসলেম তালুকদারেরও অজানা রইল না। কিন্তু সে জেনেছে বলেই ব্যাপারটা আর স্বাভাবিক রইল না। একটু ঘোলাটে হতে শুরু করল।

শাহেদের মনে আনন্দ। মুক্তিযোদ্ধাদের বধ্যভূমি আবিষ্কারের আনন্দে বিভোর সে। অন্য দিকে মোসলেম তালুকদার পড়ে গেল ভীষণ চিন্তায়। কারণ সে জানে, ভূঁইয়া বাড়ির পাঁচজন ছেলেকে রাতের আঁধারে ধরে এনে দিয়েছিল পাকবাহিনীর হাতে। ওরা এখানেই জবাই করে ওদেরকে মাটিচাপা দিয়েছিল। এখন শাহেদ যদি ব্যাপারটা থানায় জানিয়ে দেয় তাহলে একদিনেই ব্যাপারটা নিয়ে সারা দেশে তোলপাড় শুরু হয়ে যাবে। থানা থেকে পুলিশ আসবে, সাংবাদিক আসবে শহর থেকে। তাছাড়া পাবলিক সেন্টিমেন্টের বিষয় বলেও একটা কথা আছে। যদি পান থেকে চুন খসেই পড়ে তবে কী থেকে কী হয়ে যায় কে জানে!

মুক্তিযোদ্ধারা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। এতদিন ওরা এখানে অনাদরে মাটির নিচে চাপা পড়ে ছিল। শাহেদ মনে মনে ভীষণ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ল। ক্ষেতের চারপাশে প্রায় শ'পাঁচেক মানুষ জমায়েত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের এসব হাঁড়গোড় দেখার জন্য। শাহেদ ওদের উদ্দেশ্য বলল, 'সবাই শোনো। এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের বধ্যভূমি আবিষ্কার হয়েছে। আমি এখন থানায় যাব। সারা দেশের মানুষকে এ খবর জানাতে হবে।'

আমি ও তখন শাহেদের সঙ্গে থানায় গেলাম।

থানায় যাবার পথে মোসলেম তালুকদার আমাদের বাধা দিয়ে বলেছিল, 'এগুলো যে মুক্তিযোদ্ধাদের হাঁড়গোড় সে নিশ্চয়তা আছে? শুনেছি, এখানে কোন একসময় নাকি খাঁ বাড়ির পারিবারিক কবরস্থান ছিল।'

আমরা ওর কথায় মোটেও আমল দিলাম না। সোজা থানায় চলে গেলাম। খবর পেয়ে থানা থেকে পুলিশ এলো। সাংবাদিক এলো শহর থেকে। পত্রিকার পাতায় লেখা হল মুক্তিযোদ্ধার এসব কথা। তারপর এক সপ্তাহের মধ্যে সেখানে তৈরী করা হল মুক্তিযোদ্ধা বধ্যভূমি।

সাপের বিষ থাকে দাঁতে। মোসলেম তালুকদারের বিষ হল মনে। সে যে মনে মনে বিষ পুষে রেখেছিল শাহেদকে ঘায়েল করার জন্য। ঘায়েল করতে চেয়েছিলও একদিন। কিন্তু সে পরিকল্পনাতেই করেছিল ভুল। এ জন্য নিজেই ঘায়েল হল। সে কি জানত যে জীবনে এত চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এ সময়ে গ্রামের মানুষের কাছে এভাবে জব্দ হতে হবে তাকে?

ঘটনাটা ঘটেছিল রাতে।

তখন ছিল মাঝরাত। চারপাশে নিঝুম, নিস্তব্দ। পাড়ার সবাই গভীর ঘুমে অচেতন। কোথাও কেউ জেগে নেই। শুধু রাতজাগা পাখি ও ঝিঁঝি পোকাদের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

সালেহা বেগম ঘুমিয়ে তার ঘরে।

হঠাৎ বাড়ির কুকুরটা ডেকে উঠল চড়া গলায়। ঘুম ভেঙ্গে গেল সালেহা বেগমের। ঘড়িতে দেখল দুটো বাজে। এত রাতে কুকুরটা ডাকছে কেন?

সালেহা বেগম পাশের ঘরে শুয়ে থাকা ছেলেকে ডাকল, 'হাসু অ হাসু!'

হাসুর সাড়া পাওয়া গেল।

হাসু পাশের ঘরে ঘুমিয়েছিল। মায়ের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল ওর।

হাসু বলল, 'কী হয়েছে মা? আমাকে ডাকছ কেন?'

সালেহা বেগম বলল, 'একটু বাইরে বেরিয়ে দেখতো কুকুরটা ডাকছে কেন?'

'আচ্ছা, দেখছি। তুমি ঘুমাও মা।'

হাসু টর্চ লাইট হাতে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। টর্চ জ্বেলে বাড়ির চারপাশে দেখতে লাগল সে। কুকুরটা বাড়ির এক কোণে দাঁড়িয়ে অবিরাম ডেকেই যাচ্ছে। হাসুর পালন করা কুকুর। এমনিতেই ডাকে না। বাড়িতে অচেনা কাউকে দেখলেই ডেকে উঠে। এখনও হয়তো অচেনা কাউকে দেখতে পেয়েছে তাই ডাকছে কুকুরটা। কিন্তু এত রাতে কে আসবে এখানে? কোন চোরটোর আসে নি তো?

হাসু টর্চের আলোয় বাড়ির চারপাশে দেখতে লাগল। কোথাও কাউকে দেখা গেল না। চারপাশেই নির্জন। ঝিঁঝি ডাকছে। মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছে জোনাকীরা। এদিকে কুকুরটা অবিরাম ডেকেই চলেছে।

হাসু এবার ঘরের পেছনে দিকটায় গেল। গিয়েই ভয়ানক চমকে উঠল সে। চিৎকার করে বলল, 'মা ওমা, মাগো!'

সালেহা বেগম ভেতর থেকে বলল, 'কিরে হাসু? কী হয়েছে?'

'শিগ্‌গির ঘরে বাতি জ্বালো। বাড়িতে চোর এসেছে।'

'কোথায় চোর কোথায়?'

'এই তো ঘরের পেছনে সিঁধ কাটা!'

'বলিস কী?'

সালেহা বেগম চেঁচাতে চেঁচাতে তড়িগড়ি করে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলো। তার এরূপ চেঁচামেচিতে পাড়ায় যারা ঘুমিয়েছিল সবার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সবাই ছুটে এলো সালেহা বেগমের বাড়ির উঠানে। কিন্তু চোর ততক্ষণে পালিয়ে গেছে। সকালে হতে না হতে সারা গ্রামে খবর রটে গেল যে, রাতে সালেহা বেগমের বাড়িতে চোর এসে সকল গয়নাগাটি নিয়ে গেছে।

পরদিন সালেহা বেগম গ্রামের প্রধান মাতব্বর মোসলেম তালুকদারকে সব জানালো। সালেহা বেগম বলল, 'তালুকদার সাব, এখন আমি কী করব?'

মোসলেম তালুকদার বলল, 'চোরকে কি ধরতে পেরেছ?'

'না।'

'চোরকে চিনতে পেরেছ?'

'না।

'তাহলে কী করতে পারি বলো?'

'আপনি হলেন এ গ্রামের মাথা, আপনি ইচ্ছা করলে একটা কিছু করতে পারেন।'

সালেহা বেগমের এই কথাটি শোনে মোসলেম তালুকদার যেন কিছুটা খুশি হলো।

'শোনো, হাসুর মা।'

'বলেন তালুকদার সাব।'

'আমি তোমাকে যা বলব তুমি কি তা করতে পারবে?'

'কী করতে হবে আমাকে?'

'তোমাকে কিছুই করতে হবে না। যা করার আমিই করব। শুধু একট মিথ্যা কথা বলতে হবে তোমাকে।'

'মিথ্যে কথা বলব?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার গয়নাগাটি পেতে হলে মিথ্যে তোমাকে বলতেই হবে।'

'কী মিথ্যে বলতে হবে।'

'দক্ষিণ পাড়ায় শফিকুর রহমানের ছেলে শাহেদকে তো চেনো?'

'হ্যাঁ চিনি।'

'ওকে আমি দুচোখে দেখতে পারি না। দুই কলম লেখাপড়া শিখেছে বলে মাতব্বরি করে। গ্রামের মধ্যে কীসের বধ্যভূমি আবিষ্কার করেছে। তোমাকে বলতে হবে যে সে তোমার গয়না চুরি করেছে।'

'আমি তো কাউকে দেখিনি। শাহেদের নাম বলব কী করে? না, না আমি তা বলতে পারব না।'

'গয়না পেতে হলে তো আগে চোর ধরতে হবে।'

'কিন্তু শাহেদ কি চোর? ও শিক্ষিত ভালো ছেলে। ও চুরি করবে কেন? এ কথা গ্রামের কেউ বিশ্বাস করবে?'

'কীভাবে বিশ্বাস করাতে হয় আমি তা জানি। তুমি শুধু ওর নামটা বলে দেবে। তারপর যা করার আমি করব।'

'না না, মাতব্বর সাব, আমি মিথ্যা বলতে পারব না।'

'ঠিক আছে। তা যদি বলতে না পারো, মোহনপুরের জ্যোতিষকে নিয়ে এসো। জ্যোতিষ আয়নাপড়া দিয়ে চোরের নাম বলে দেবে। তখন চোরও ধরা পড়বে, তোমার গয়নাও পেয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে। আমি তাই করব।'

সালেহা বেগম চলে গেল।

মোসলেম তালুকদার মনে মনে বলল, শাহেদকে জব্দ করার দারুন একটা সুযোগ আমি পেয়ে গেছি। এ সুযোগ কোন মতেই আমি ছাড়ব না, কিছুতেই না। তারপর মোসলেম তালুকদার আনন্দে নৃত্য করতে করতে গাইতে লাগল,

আজ কিছু হতে চলছে,

আজ কিছু হতে চলেছে...।

আজ কিছু হতে চলেছে ...

আজ কি সত্যিই কিছু হতে চলেছে? হয়তোবা। কী হতে চলেছে? তা জানা যায় নি। কিন্তু আশেপাশের পাঁচগ্রাম থেকে শত শত মানুষ কী কারণে আজ সালেহা বেগমের বাড়ির উঠানে এসে জমায়েত হয়েছে তা অবশ্য জানা গেছে।

উঠানভরা বিভিন্ন বয়সের ওধরনের মানুষ। খবরটি যে শুনছে সে-ই কৌতূহল নিয়ে ছুটে এসেছে।

কেউ বলছে, 'আজ চোরের খবর আছে?'

কেউ বলছে, 'এবার শালা বুঝবে?'

কেউ বলছে, 'হোয়াট উইল হেপেন টু হিম?'

কেউ বলছে, 'তালুকদার সাহেব নিজেই যেহেতু বিষয়টার প্রতি আমল দিয়েছে, আজ তো একটা কিছু হবেই।'

কয়েকজন সমস্বরে বলে উঠল, 'হবে, হবে, আজ একটা কিছু হবে!'

এ রকম পাঁচজনের পাঁচ কথায় যখন সালেহা বেগমের বাড়ির উঠান মুখরিত, তখনই আগমন করল গ্রামের সবচেয়ে বিত্তশালী ও ক্ষমতাবান মানুষ মোসলেম তালুকদার। সঙ্গে সঙ্গে সবাই নীরব হয়ে গেল। পিনপতন নিরবতা নেমে এলো সবার মাঝে। মোসলেম তালুকদার একটা হাতলঅলা চেয়াল দখল করে বসল। তার পাশে আরও কয়েকটি চেয়ার দখল করে পাশাপাশি বসে আছে গ্রামের অন্যান্য গণ্যমাণ্য ব্যক্তিরা। মোসলেম তালুকদার বেশ উৎসাহি মনে এদিক ওদিক চোখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মানুষজন দেখে নিল।

গ্রামের দশজন মোসলেম তালুকদারকে সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে। কিন্তু ওরা কি সত্যিই ওকে সম্মান করে? শ্রদ্ধা করে? এই যে মোসলেম তালুকদারের আগমনে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। একি ওর প্রতি শ্রদ্ধা নাকি ভয়? আসলে গ্রামের মানুষ ওকে শ্রদ্ধা করে না। সম্মানও করে না। ভয় করে। কারণ কেউ ওর বিরুদ্ধে টু শব্দটিও উচ্চারণ করলে তার জমির ফসল কেটে নেবে কিংবা জমিটাই দখল করে নিয়ে নিজের ভূ-সম্পত্তি বাড়িয়ে নেবে সে। এর জন্য অর্থবল, বাহুবল সবাই আছে ওর। এসব শক্তি-বল অর্জন করেছে সে চল্লিশ বছর আগেই। চল্লিশ বছর আগে সে যেরকম বলে বলিয়ান হয়ে একাজ করত আজও সেরকম বলে বলিয়ান হয়ে একই কাজ করতে পারছে। দুটি সময়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, তখন তাকে সাহায্য করেছে পাকহানাদার আর এখন তাকে সাহায্য করছে দেশের প্রচলিত আইনের ফাঁক-ফোঁকর।

জ্যোতিষ বেশ গম্ভীরভাবে বসে আছে। পরনে লাল ফতুয়া, এ পোশাকই ওকে ওর পরিচয় করিয়ে দেয়। জ্যোতিষের দেহের গঠন লম্বাটে। মাথার চুল উশ্‌কোখুশকো। সব চুলই সাদা। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। দু'ঠোটের পাশে ঝুলে আছে লম্বা গোঁফ। দাড়ির তুলনায় গোঁফগুলো একটু বড়। দুটো চোখ ভাসা ভাসা। যেন আগুন ঝিলিক দিয়ে উঠে ঐ চোখে। চোখের ভেতরে অন্তর্ভেদী দুটি মণি বসানো, এতে আছে সম্মোহনের এক অদ্ভুত শক্তি। একবার কারো দিক দৃষ্টিপাত করলে পুড়ে ফেলতে পারে তার ভেতর-বাহির।

জ্যোতিষ হাতে একটা আয়না নিয়ে ওর কর্ম শুরু করল।

পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ, ঈশান-অগ্নি, বায়ু-নৈঋত, ঊর্ধ্ব, অর্ধ-দশ দিকে হাতের আঙ্গুল উচিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্রপাঠ করতে লাগল জ্যোতিষ। উঠোনের চারপাশে বিভিন্ন বয়সের মানুষ। সবাই নীরব, নিশ্চুপ। সবার চোখের দৃষ্টি এখন জ্যোতিষের দিকে। জ্যোতিষ আয়না পড়া দিয়ে গয়না চোর ধরে দিবে, এ কথা যে শুনেছে কৌতূহল নিয়ে সে-ই ছুটে এসেছে। এখন সেটাই দেখার জন্য উৎসাহে অপেক্ষা করছে সবাই।

জ্যোতিষ মন্ত্রপাঠ করা শেষ করে ব্যাগ থেকে একটা হাঁড় বের করে এদিক ওদিক ভালো করে দেখে নিয়ে আবার মন্ত্রপাঠ করা শুরু করল। মিনিট পাঁচেক মন্ত্র পড়া শেষ করে হাতের হাঁড়টা দিয়ে আয়নার ওপরে টন্ টন্ টন্ করে তিনবার আঘাত করল। হঠাৎ আয়নার ওপরে মিহিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে জ্যোতিষ বেশ আনন্দিত গলায় বলে উঠল, 'এই তো দেখা যাচ্ছে!'

উঠানভরা সব মানুষও প্রায় চিৎকার করে বলল, 'কী দেখা যাচ্ছে, কী দেখা যাচ্ছে?'

জ্যোতিষ বলল, 'গয়না চোরের ছবি ও নাম।'

'কী নাম, কী নাম চোরের?'

কৌতূহলি সবাই চোরের নাম শুনতে চাইল। কিন্তু জ্যোতিষ নাম বলতে চাইল না। জ্যোতিষ বলল, 'না। এখন আমি নাম বলব না। তাহলে আপনারা এখনই গোলমাল শুরু করবেন।'

এ সময়ে জ্যোতিষের পাশেই বসা মোসলেম তালুকদার বলল, 'আপনি কোন ভয় পাবেন না। নির্ভয়ে শুধু চোরের নামটা বলে দেন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। শুধু নামটা বলে দেন।'

মোসলেম তালুকদারের কথায় সায় দিল সবাই।

জ্যোতিষ নাম বলার আগে একবার মোসলেম তালুকদারের দিকে তাকালো। তালুকদার জ্যোতিষকে চোখ টিপে কী যেন বুঝিয়ে দিল। পরক্ষণেই জ্যোতিষ বলতে লাগলো, 'ঠিক আছে, আমি নাম বলছি। চোর আপনাদের গ্রামেরই ছেলে। শুধু শুধু গোলমাল না করে বিচার করে সাজা দেবেন।' একটু থেমে ফের বলল, 'আমার মন্ত্রবলে আয়নায় যে নাম ও ছবি আমি দেখতে পেয়েছি সেটা হল শাহেদ।'

জ্যোতিষ শব্দটি উচ্চারণ করার পরেই লোকজনের মাঝখানে থেকে সালেহা বেগমের চুরি যাওয়া গয়নাগুলো হাতে নিয়ে আসল চোর রবিউল নামের এক যুবক ক্ষ্যাপা বাঘের মতো জ্যোতিষের দিকে ছুটে গেল। তারপর জ্যোতিষের গলায় চেপে ধরে লাথি, কিল ও ঘুষি মারতে মারতে বলতে লাগল, 'শালা ভন্ড! গয়না চুরি করলাম আমি আর তুই নাম বলিস শাহেদের। আজ তোকেই মেরে ফেলব!'

তারপর রবিউলের লাথি, কিল আর ঘুষির আঘাতে রক্তাক্ত হয়ে জ্যোতিষ বলল, 'আমার কোন দোষ নেই। মাতব্বর সাহেবই আমাকে শাহেদের নাম বলতে বলেছে! তাই আমি ওর নাম বলেছি!'

মোসলেম তালুকদার তখন মাথা নীচু করে বসেছিল চুপচাপ। সবাই অবাক চোখে তাকাল ওর দিকে। কিন্তু কেউ মুখ ফুটে কিছুই বলল না। তবে মনে মনে সবাই উচ্চারণ করল, ছিঃ! তালুকদার সাহেব ছিঃ!

মোসলেম তালুকদার কি কখনো স্বপ্নেও ভেবেছিল যে, জীবনের এত চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এসে এ সময়ে গ্রামের মানুষের কাছে এভাবে অপমানিত হতে হবে? ঘুণাক্ষরেও তা ভাবে নি সে।

মোসলেম তালুকদারকে দেখে আমার এই গল্পটা মনে পড়ল। এ মুহূর্তে আমার মনে হল, এই যে মোসলেম তালুকদার এখন আমাকে ভালোমন্দ জিজ্ঞেস করল একি সত্যি নাকি মেকী? একজন মানুষ আরেকজন মানুষের

ভালোমন্দ কেন জানতে চায়? সত্যিই সে ভাল আছে কিনা তা জানার জন্য নাকি এটা লৌকিকতা শুধু?

রিকশা আমাদের গ্রামে ঢুকে পড়ল। ছেলেবেলার স্কুলটা দেখা গেল রিকশা থেকে। স্কুলের সব দরজা জানলা বন্ধ। আজ কি স্কুল বন্ধের দিন?

হয়তোবা।

গ্রামের ভেতর দিয়ে রিকশা ছুটে চলেছে।

আমাদের গ্রামটা আর গ্রাম নেই। মনে হয় যেন ছোট শহর। অনেক পাকা বাড়িঘর উঠেছে। রাস্তার দুপাশে সারি সারি গাছ দাঁড়িয়ে আছে। গাছের ডালে দোয়েল, শালিক ও অতিথি পাখিরা কল-কাকলীতে মুখর করে তুলল। আমি মুগ্ধ হয়ে পাখিদের এসব কল-কাকলী শুনতে লাগলাম। কতদিন এসব শুনি না!

রিকশা আমাদের বাড়ির সামনে এসে থামল। রিকশার শব্দ শোনে আমার ছোটবোন রিতা বেরিয়ে এলো বাড়ির ভেতর থেকে। রিতা বেরিয়ে এসে আমাকে দেখেই চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করল, 'ভাইয়া এসেছে, ভাইয়া এসেছে!'

আমি বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম।

রান্না ঘর থেকে হাসতে হাসতে, কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলো আমার মা। সাতবছর পরে আমি আমার মায়ের মুখটা এই প্রথম দেখলাম। যখন আমি সৌদীআরবে আটচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস রৌদ্রতাপে পুড়ে খাক হতাম তখন এই মুখটাই কেবল আমার মনে পড়ত বারবার। আজ এই মুখটা দেখে আনন্দে কিংবা বেদনায় আমার ভেতরের সবকিছু ভেঙ্গেচুরে বাঁধ ভাঙ্গা জলের মতো দু'চোখ বেয়ে অশ্রু বেরিয়ে এলো। বুকের ভেতরের সব হাহাকার, সব দীর্ঘশ্বাস যেন বেরিয়ে আসতে চাইল বুক চিরে। মা আমাকে বুকে টেনে নিল। আমি আমার মায়ের বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ছোটবেলার মতো হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলাম।

আমি এখন সুখী, ভীষণ সুখী মানুষ। ভুলে গেছি আমি সৌদী আরবের আটচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস রৌদ্রতাপের দুঃসহ সেই স্মৃতি। সেই স্মৃতি কি মনে রাখা যায়? আমি আমার মা, বাবা, ভাই ও বোনদের কাছে ফিরে এসেছি এর চেয়ে সুখের বিষয় আর কী হতে পারে আমার জন্য? এটা তো শুধু ফিরে আসা নয়, প্রত্যাবর্তন। এখন আর আমার আটচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার রোদে পোড়ার কোন সংশয় নেই। এখন আছে আটচল্লিশ কিলোমিটার বেগে বয়ে চলা দক্ষিণা সুশীতল বাতাস। সৌদী আরবে পুড়িয়ে আসা শরীর আমার জুড়িয়ে নেব সেই বাতাসের নিঃশব্দ পরশে। কী যে সুখ এখন, আহ! কী যে দুঃখ ছিল তখন, উফ!

কেবলি স্বপ্নের ক্ষয় হয়...

রাতের খাবার খেয়ে আমি আমার শোবার ঘরে এলাম। এ ঘরেই কেটেছে আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন। মাঝখানে সাতটি বছর সৌদী আরবে কাটিয়ে ফের সেই একই ঘরে ফিরে এলাম। ঠিক যেন পাখিদের নীড়ে ফেরার মতো। আমার ঘরটা সেই আগেরই মতো সাজানো গোছানো। ড্রেসিং টেবিল, আলমারী, শো'কেস, বুকসেল্‌ফ। সেল্‌ফভরা বই রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ও জীবনানন্দ দাসের ছবি ঘরের এখানে সেখানে টানানো। আমি বুকসেল্‌ফ থেকে জীবনানন্দ দাসের রচনা সমগ্র বের করে আনলাম। কতদিন জীবনানন্দ দাস পড়া হয় না! আমি বইটা চোখের সামনে মেলে বিছানায় শোয়ে একটা কবিতা পড়তে লাগলাম।

"কেবলি স্বপ্নের ক্ষয় হয়,
তার কোন ক্ষয় নেই, চারদিকে চলেছে সময়;
বন্দরের কোয়াশার কোলাহলে,
পৃথিবীর কোল থেকে অবিরাম উৎসারিত জলে
এরিয়েল ধ্বনির প্রবাহে,
অন্ধকারে অন্তহীন মানুষ বা মাছির পতনে
কনফারেন্স প্ল্যান কমিশনে।
নগরির শক্তি নষ্ট হয়ে যায় চারিদিকে
কেবলি গ্রামের ধ্বংস হয়...।"

কবিতাটি আর পড়তে ইচ্ছে হল না। প্রচন্ড ঘুমে আমার দুচোখ জ্বালা করতে লাগল। বন্ধ হয়ে আসতে চাইল চোখ দুটি। আমি বালিশের কাছে বইটি রেখে দু চোখের পাতা বন্ধ করলাম।

অনেকদিন পরে আজ আমি আবার আমার ঘরে ঘুমালাম।

সকালে একটু দেরিতে ঘুম ভাঙ্গল। সৌদী আরবে কখনো এত দেরি করে ঘুম ভাঙ্গেনি আমার। সেখানে ভোর হবার আগেই ঘুম ভাঙ্গতো। ঘুম ভাঙ্গলেই বিছানা ছেড়ে উঠে কাজে যাবার তাড়া ছিল। এখন সেরকম কোনো তাড়া নেই। তাই ঘুমের সময়টা আমি ইচ্ছে করেই একটু দীর্ঘ করে নিলাম।

ঘুম ভাঙ্গার পরেই আমি দেখলাম সকালের সোনালি রোদ জাফরির ফাঁক গলিয়ে আমার ঘরে এসে পড়েছে। আমি বিছানা ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে রইলাম চুপচাপ। এখন বাড়িটা আমার কাছে

কেমন খালি খালি মনে হল। মা রান্না ঘরে। রিতা স্কুলে চলে গেছে। বাবা ফযরের নামায শেষ করে নিজের ঘরেই কোরআন তেলাওয়াত করছেন।

আমি বারান্দা থেকে নেমে বাগানে এলাম। বাগানের প্রায় প্রতিটি গাছেই ফুল ফুটে আছে। গোলাপ, গন্ধরাজ, বেলী, ফুলে ভরে গেছে পুরো বাগান। দক্ষিণা বাতাস বইছে। বাগানের অদূরে বাড়ির এক কোণে নিম গাছের উচুঁ ডালে বসে ডেকে যাচ্ছে নাম না জানা একটি পাখি। এ মুহূর্তে বাগানের বৃক্ষ, ফুল ও পাখির সমারোহে নিজেকে বড় হাল্কা, বড় ফুরফুরে মনে হল। আমার ইচ্ছে হল একটা গান গাইতে। আমি গুনগুন করে একটা গান গাইতে লাগলাম-

"আমি সোনার হরিণ ধরতে গিয়ে
অনেক করেছি ফন্দি,
শেষে জানলাম মানুষ নিজেই
ভাগ্যের জালে বন্দি।"

আমি গানটা গাইতে গাইতে বুঝতে পারলাম, ক্ষুধায় আমার পেটে চিনচিনে ব্যথা শুরু হয়েছে। সকালের নাশতা খাওয়া হয়নি এখনো। এদিকে সকাল গড়িয়ে প্রায় দুপুর হয়ে আসছে।

আমি নাশতা খেতে ঘরে ফিরে এলাম। ডাইনিং টেবিলে এসে দেখি মা আমার নাশতা দিয়ে রেখেছে সেই কখন। আমি একটা আপেল কামড়ে খেতে খেতে আমার ঘরে ফিরে এলাম। বুক সেল্‌ফটা খুললাম। সেল্‌ফের তাকে তাকে আমার হাতে সাজানো বই। নিচের তাকে লিখার কাগজ। কতগুলো সাহিত্য পত্রিকা। কয়েকটা পুরনো ডায়েরী। ছাত্রজীবনে আমি যে ডায়েরীতে রোজনামচা লিখতাম সেটা বের করে এনে বিছানায় শোয়ে পাতা ওল্টাতে লাগলাম। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ কালো কালির মোটা অক্ষরে লিখা একটা দুই অক্ষরের নামে আমার চোখ আটকে গেল। অবশ্য লাল কালি দিয়ে নামটা আমি কেটেও রেখেছি। তবু ও সেটা বোঝা যাচ্ছে, রুবা। সেই যে...যার গল্পটা আমি বলেছি। আমি ডায়েরীটা রেখে দিলাম সেল্‌ফে। আপেলটা খাওয়া হয়ে গেছে। আমার ঘরটা কেমন এলোমেলো হয়ে আছে। কাঁথা, কম্বল, বালিশ, বিছানা, চাদর সবকিছুই অগোছালো। শিথানের পাশে রাত জেগে পড়া জীবনানন্দ রচনা সমগ্র খোলাই পড়ে আছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে কিছু কাগজের স্তুপ। সব মিলিয়ে কেমন বিশ্রী, এলোমেলো দেখাচ্ছে ঘরটাকে। আমি ঘরটাকে সাজিয়ে গোছিয়ে সুশ্রী করলাম না। এলোমেলোই রেখে দিলাম। জীবনটাই যেখানে এলোমেলো, অগোছালো সেখানে ঘরের সাজানো গোছানো আর পরিপাটিতে কী হবে?

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আবার বারান্দায় ফিরে এলাম। এখানে এসে একটু আগে আমার মনে একটা ফুরফুরে আমেজ জেগে উঠেছিল। কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। রুবা ও তার স্মৃতি আমার সকল ভালো লাগা কেড়ে নিয়ে আমার মুড অফ করে দিল।

আজ এত বছর পরেও রুবাকে আমি ভুলতে পারলাম না। রুবার মুখটা সেই যে প্রথম দেখাতে বুকের গহীনে খোদাই করেছিলাম এখনো তা অম্লান। থাকবে চিরকাল, কখনো আমি ভুলব না রুবাকে। ভুলব না তার হাসিমাখা মুখটা, তার দু'টি চোখ, তার ফুলঝরা কথা, তার প্রেম, তার স্মৃতি। ভুলব কেমন করে? "সে চলে গেছে বলেই কি গো স্মৃতিও তার যায় ভোলা...।"

আমি আবার বাগানে এলাম। ফুটন্ত ফুলের গন্ধ ভেসে এলো বাগান থেকে। কেন জানি, এ মুহূর্তে ফুলের গন্ধ আর আগের মতো ভালো লাগল না আমার। একটু আগেও এই ফুলের গন্ধ আর সৌরভে মন ভরে উঠেছিল, জেগে উঠেছিল একট ফুরফুরে আমেজ আমার মাঝে। সেই একই ফুলের গন্ধ ভেসে এলো। কিন্তু এখন আমার কাছে তা মোটেও ভালো লাগল না। ইচ্ছে হল, বাগানের সব ফুল ছিড়ে এনে পায়ের তলায় পিষে দলিতমথিত করে ফেলি।

আমি ফুলগুলো ছিঁড়লাম না। দলিতমথিত ও করলাম না পায়ের তলায় পিষে। আমি বড় অভাগা, চির কাঙ্গাল। এ জন্য ফুল ছিঁড়ে কী হবে? ফুলের কী দোষ? ফুল চির অকৃপণ। ফুলের গন্ধের ও কোনো কার্পণ্য নেই। গন্ধ যখন বিলোয় সময়ের ভেদাভেদ না করেই বিলোয়। কারো ভালোলাগা বা না লাগাতে ফুলের কিছুই যায় আসে না। তাই তো ফুল সুন্দর, পবিত্র। আমি বাগানের ফুলের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে ফুল। তোমাদের ওপরে আমার কোন রাগ নেই। নেই কোন আক্ষেপও। গন্ধ যখন বিলোচ্ছ, গ্রহণ করছি।'

আমি একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রইলাম চুপচাপ। অবিরাম ফুলের গন্ধ ভেসে এলো। ডালে ডালে পাখিদের কল-কাকলীও শোনা যাচ্ছে। ঝিরঝিরে বাতাস চলছে বয়ে। কিন্তু এসবের মাঝে আমার মন নেই। আমার মন অন্যখানে। আমার মনের মাঝে শুধু রুবা নামের একটা শব্দ। যার কুলপ্লাবনী রহস্য বা মৌন মাদকতায় উন্মত্ত আমি এখন। যেন আমি ঘোরের মধ্যে ডোবে আছি। সকাল বেলা ঘুম থেকে জেগে বাগানে এসে দাঁড়াতেই কী বিষম সুখ এসেছিল আমার মনে। কিন্তু রুবা ও তার স্মৃতি সেই সুখ কেড়ে নিল। এখন সুখের বদলে কেমন নিঃসঙ্গ, কেমন একাকীত্ব বোধ হচ্ছে আমার। রুবার মুখটা, ওর চোখ দু'টো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল বারবার। আমি চোখ বন্ধ করলেই যেন ওকে দেখতে পাচ্ছি। ও হাসছে, কথা বলছে। ঠিক আগের মতো।

আমি যখন শুশুন্ডা গ্রামে রুবার খুব কাছাকাছি ছিলাম তখন থেকে ওর বিয়ে হওয়া, আমার পড়াশোনা, বিদেশ গমন, সাত বছর পরে বিদেশ থেকে ফিরে আসা নিয়ে মাঝখানে প্রায় দশটি বছর কেটে গেছে। এই দশ বছরে আমার কখনো রুবার জন্য এতটা মন খারাপ লাগেনি, ঠিক এ মুহূর্তে যেমনটা লাগছে। এখন আমার খুব মনে পড়ছে রুবাকে। যদি এখন আমি একবার রুবাকে দেখতে পেতাম। জানি, রুবা এখন সখীপুর স্কুলেই আছে। কী করছে এখন রুবা? ওকি এখন স্কুলের ছেলেমেয়েদের পড়া নিয়ে ব্যস্ত। আমার কথা কি একবার হলেও ওর মনে পড়ছে এখন?

রুবার কথা ভাবলেই সুখ। আহ্! কী শীতল স্পর্শ হৃদয়জুড়ে, রুবা, রুবা! প্রাণের মাঝে প্রশান্তি, রুবা, রুবা!

আমি এখন রুবার কাছে যাবো, 'হে প্রবাহমান বাতাস! হে গাছের পাখি! তোমরা সখীপুর যাও। রুবাকে গিয়ে বলো, আমি আসছি।'

আমি পুকুরে নেমে গোসলটা সেরে পেট পুরে খেয়ে নিলাম ঝটপট। এখন বের হব। রুবার কাছে যাবো। সত্যি রুবার কাছে যাবো। রুবাকে কাছ থেকে দেখবো। দেখবো ওর চোখের দিকে তাকিয়ে আগের মতো আছে কিনা ওর চোখ দু'টো। আগের মতো আমার মন কেমন করা অনুভূতি হয় কিনা ওর চোখের দিকে তাকালে।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে হাতের সামনেই একটা রিকশা পেয়ে তাতে উঠে পড়লাম। রিকশা চলতে শুরু করল। রিকশায় বসে পথ চলতে চলতে হঠাৎ অন্যমনস্কভাবে মনে পড়ে গেল দশ বছর আগের সেসব কথা। কলেজ, ক্যাম্পাস, প্রমত্ত বান্ধবদল, ক্লাশরুমের মধ্য সারিতে বসা ধানী রঙ পাড় আর মেঘ রঙ শাড়ীপরা একটি মেয়ে, তার পাগলাটে হাসি, চোখের যাদুময় দৃষ্টি। এই চোখের দৃষ্টিই আমাকে কাছে টেনেছিল চুম্বকের মতো। আমি একটু ছুতো পেলেই ছুটে যেতাম ওই চোখের কাছে যখন তখন। তারপর কিছু করা বা কিছু বলার না পেয়ে ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে নোট নেবার ছলনায় ডায়েরির পাতায় রোজনামচা লিখতাম। আমার লেখা ডায়েরি ভরা এসব রোজনামচা যদি সংকলন করা হতো তাহলে একেকটি লাইন, বাক্য, শব্দ হতো শ্রেষ্ঠতম কবিতার সংকলন।

আমার রিকশাটা অবিরাম ছুটে চলছিল। হঠাৎ একটা ব্রীজের ওপর থেকে নামতে গিয়ে রিকশায় ঝাঁকুনি খেলাম একটু। লাফিয়ে উঠলাম আমি। রাস্তার পাশে মাঠে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে।

আমি রিকশাওয়ালাকে বললাম, 'রিকশাটা একটু থামাও। ওই ছেলেটার একটা বল করা দেখি।'

রিকশা থামল।

একটা লম্বাটে ছেলে দৌড়ে এসে বল করল। যে ছেলেটা ব্যাট করছিল বলটা সে ভালোভাবে খেলতে পারল না। ওর খেলতে না পারা দেখে আমার হাত নিসপিস করতে লাগল। অফ স্টাম্পের বাইরে দিয়ে যাওয়া বল ড্রাইভ করতে না পারলে ব্যাট হাতে মাঠে নামা কী জন্য? ছোট বেলায় আমি যখন ক্রিকেট খেলতাম এসব বলকে কতবার মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি। ক্রিকেটে যদি ডাবল সিক্স হওয়ার বিধান থাকতো তাহলে ওগুলো তা-ই হতো।

'ঠিক আছে, যাও।' আমি রিকশাওয়ালাকে যেতে বললাম।

রিকশা ফের চলতে লাগল।

বলছিলাম রোজনামচা লিখার ব্যাপারে।

সত্যি বলতে কি, তখন ডায়েরিতে আমি যা লিখেছি তা এখন ঠিকমতো মনে পড়ছে না। শুধু রুবার মুখ ও চোখ দু'টো মনে আছে। সবারই একটা প্রিয় মুখ থাকে। আমার প্রিয় রুবার মুখ। রুবার প্রিয় সেই মুখটা ছাড়া এখন আর কিছুই মনে নেই আমার। আমার স্মৃতিশক্তি নেই । নেই কোন কিছু মনে রাখার ক্ষমতা। আমি স্মৃতিহীন নই, আমি রুবার মুখের স্মৃতি বয়ে এসেছি দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী। বয়ে যাব যুগ যুগ ধরে।

রিকশাটা সখীপুরের কাছাকাছি চলে এলো।

আমি রিকশায় বসে আছি নিঃসঙ্গ ছায়ামূর্তির মতো। আমি আমার যাপিত জীবন নিয়ে ভীষণ বিব্রত। জীবনে কোনো কিছুই আমি ঠিকমতো করতে পারিনি। কিছুই হতে পারিনি। এ জীবনে কত স্বপ্নই তো দেখেছি। ক্রিকেটার হবো, যাত্রাপালার নায়ক হবো, রাজা হবো। করেছি অনেক চেষ্টা। কিন্তু কিছুই হলো না। জীবনের এ পর্যায়ে এসে মনে হচ্ছে, এই যে এত আশা, এত স্বপ্নের জালবোনা জীবনে, এর জন্য তো প্রয়োজন ছিল না এত স্বপ্ন দেখার। শুধু স্থূল ভঙ্গীতে ভিখীরির মতো দুই হাত বাড়িয়ে রাখলেই হতো। দশ বছর আগে শুশুন্ডা কলেজে পড়াকালে রুবা আমার হাত ছুঁয়ে বলেছিল, 'এই হাতে হাত রাখো। ছেড়ো না কখনো। ধরে রেখো শক্ত করে।'

আমি তখন রুবার হাত ধরেছিলাম। শক্ত করে ধরেছিলাম কিনা জানি না। কেন যেন ওর হাত ধরে রাখতে পারলম না। ছাড়তে হল । জগতে বউ করে ছাড়া মেয়ে মানুষকে ধরে রাখার কোনো উপায় নেই। তাই তো রুবা চলে গেছে। রুবা চলে গেছে যাক। কিন্তু এত বছর পরেও আমাকে কেন রুবার কথা ভেবে ভেবে অস্থির হতে হবে। আমি তো তখন রুবার চলে যাওয়াতে একটু ব্যাথা পাইনি। কিন্তু এখন...?

সখীপুর পৌঁছানোর যে পথটুকু বাকি ছিল সেটা ফুরিয়ে এলো। এখন রিকশা থেকে নামলেই সেই স্কুলটা।

রিকশা স্কুলগেটের সামনে এস থামল।

আমি নামলাম রিকশা থেকে। একটু দ্বিধা, একটা সংশয় কাজ করতে লাগল আমার মনের মাঝে এখন। রুবা আমাকে দেখে কী ভাববে কে জানে! ও কি খুশি হবে আমাকে দেখে? জানি না।

রেলস্টেশনের পাশেই রুবার স্কুলটা। স্কুলের আঙ্গিনা জুড়ে ছোট বড় অনেক গাছ দাঁড়িয়ে আছে নিঃশব্দে। সব গাছেই ফুল ফুটে আছে, ফল ধরে আছে। দুধের মতো সাদা স্কুল ভবনের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। স্কুল ভবনের সব দরজা-জানালা বন্ধ। দরজা-জানালা বন্ধ কেন? আজ কি তবে ছুটির দিন? হয়তোবা। কিন্তু স্কুলে ছুটি থাকলে তো এখানে রুবা থাকবে না। রুবাকে আমি পাব কোথায়?

আমি স্কুল ভবনের বারান্দায় উঠে এলাম। যা ভেবেছিলম তাই হল। আজ স্কুল ছুটি। সমস্ত স্কুল ফাঁকা। কোথাও কেউ নেই। পতাকা উড়ছে না। টিচার করছে না আনাগোনা । ছাত্র-ছাত্রীর নেই কোন হইচই। আমি মন খারাপ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম বারান্দায়। বিরক্ত হয়ে সিগারেট ধরালাম একটা। সিগারেটে টান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম বারান্দার এককোণে একটা লোক বসে আছে। আমি লোকটার কাছে এগিয়ে গেলাম। লোকটাও আমার দিকে কিছুটা এগিয়ে এলো। এসে আমাকে বলল, 'কাকে চান স্যার?'

লোকটা আমাকে স্যার বলে সম্বোধন করল কেন আমি বুঝতে পারলাম না।

আমি বললাম, 'আপনার পরিচয়টা কি জানতে পারি?'

'অবশ্যই জানতে পারেন। কেন জানতে পারবেন না?'

'তাহলে আপনার পরিচয়টা বলুন, প্লিজ।'

'আমার নাম মতিউর রহমান। সবাই আমাকে মতি বইলা ডাকে। আমি এই স্কুলের দপ্তরি। আপনি কোথা থেকে আইছেন?'

'কুসুমপুর থেকে এসেছি।'

'কার কাছে আইছেন। মাইনে আপনি কারে চান?'

'রুবাকে নিশ্চয়ই চেনেন? এই স্কুলের টিচার। অবশ্য ও এখানে নতুন জয়েন করেছে।'

'হ। চিনতে পেরেছি। কিন্তু স্যার...?'

'কিন্তু কী?' মতিকে বলতে না দিয়েই বললাম আমি।

'রুবা মেডাম তো নাই।'

'নেই?'

'না, চলে গেছে।'

'চলে গেছে?'

'হ।'

'কোথায়?'

'মনে হয় বাড়ি গেছে। স্কুলতো স্যার পাঁচদিন ছুটি। এই জন্যে মেডাম বাড়ি চইলা গেছে।'

মনে মনে বেশ নিরাশ হলাম। কী করব আমি এখন? কুসুমপুর ফিরে যাবো? রুবার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমি এতদূর পর্যন্ত ছুটে এলাম। কিন্তু সেটা বুঝি আর হলো না। রুবা এখন কোথায় আছে কে জানে। ও কি শুশুন্ডায় ওর বাবা মায়ের কাছে নাকি ওর স্বামীর বাড়ি গেছে আমি তা জানি না। জানলে ওখানে যাওয়া যেত।

মুরাদপুর। রুবার স্বামীর গ্রামের নামটা ঠিক মনে করতে পারলাম তো!

আমি স্কুল থেকে বেরিয়ে এলাম। তারপর স্কুলের বাঁ পাশের রাস্তা ধরে আমি দিকহীন, উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে লাগলাম। আমি এখন কোথায় যাবো, কার কাছে যাবো, কী করবো কিছুই জানি না। কিছুক্ষণ হেঁটে একটা তে-পথের মোড়ে এসে দাঁড়ালাম। একটা ঝুপড়ির মতো দোকান দেখে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। একজন মাঝ বয়েসী দোকানদার চা-বিস্কুট ও কলা বিক্রি করছে। দোকানদারের মাথায় বেশ লম্বা চুল। মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। পরনে লুঙ্গি ও গলায় জড়ানো গামছা। লোকটা পান চিবুতে চিবুতে চা বানাচ্ছে বিক্রির জন্য। দোকানের সামনে কয়েকজন লোক বসে চা-সিগারেট খাচ্ছে।

আমি দোকানদারকে বললাম, 'ভাই, মুরাদপুর গ্রামটা কোন্ দিকে?'

'ওই দিকে।' দোকানদার লোকটা হাতের ইশারায় পূর্ব দিকে বেশ দূরে বৃক্ষ সমেত আলো ছায়াময় একটা গ্রাম দেখিয়ে ফের বলল, 'ঐডাই মুরাদপুর।'

'আমি মুরাদপুর যেতে চাই। কীভাবে যাওয়া যায় একটু বলবেন আমাকে?'

'দুইভাবে যাইতে পারেন।'

'সেটা কীভাবে?'

'রিকশায় নইলে নৌকায় চইড়া যাইতে পারেন। তবে...।'

'তবে কী?' দোকানদারকে বলতে না দিয়েই বললাম আমি।

'রিকশায় গেলে অনেক দেরি অইব। রিকশা রাস্তায় রাস্তায় ঘুইরা যাইব তো, ম্যালা সময় লাগব। আপনে এক কাজ করেন।'

'কী কাজ , বলুন?'

'আপনি নৌকায় চইলা যান। বিলের মাঝখান দিয়া নৌকা সোজা মুরাদপুর চইলা যাইব। বেশি সময় লাগব না।'

'ওখানে যেতে কতটুকু সময় লাগতে পারে?'

'কী দিয়া যাইবেন? রিকশায় না নৌকায়?'

'জ্বী, নৌকায় যদি যাই?'

'কী নৌকায় যাইবেন?'

'মানে?'

'ডিঙ্গি নাকি কোশা নৌকায়?'

শেষের শব্দটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবু আমি বললাম, 'কোশা নৌকায়ই যাবো।'

'ছইঅলা না ছই ছাড়া?'

'ছইঅলা।'

'বাদাম দেয়া না বাদাম ছাড়া?'

'বাদাম মানে কী, পাল?'

'হ।'

'জ্বি, পালতোলা।'

লোকটা এবার এদিক ওদিক চোখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কী যেন দেখে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাইলে ভাই, বাতাসের বেগ না দেখে কইতে পারুম না।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'মানে?'

দোকানদার আমাকে বুঝালো, 'বাতাসের বেগ বেশী অইলে বাদামে বাতাস লাগব জোরে। নৌকা চলব ট্রলারের মতো। আপনে তাড়াতাড়ি যাইতে পারবেন। বাতাসের বেগ কম অইলে দেরি অইব।'

লোকটার সঙ্গে কথাবলে আমি বেশ মজা পাচ্ছিলাম। ইচ্ছে হল, আরও কিছুক্ষণ কথা বলি ওর সঙ্গে।

কিন্তু আমাকে যে মুরাদপুর যেতে হবে।

আমি কিছুটা পথ সামনে হেঁটে নৌকা ঘাটে এলাম। ঘাটে অনেকগুলো নৌকা। পুরনো একটা বটগাছের নিচে রশি দিয়ে বেঁধে রেখে লগি, বৈঠা ও পাল নিয়ে বসে আছে নৌকার মাঝিরা। আমাকে দেখে প্রায় সবাই জিজ্ঞেস করতে লাগল, 'ভাই, যাইবেন?'

আমি কোথায় যাব তা না জেনেই ওরা আমাকে যাব কিনা জিজ্ঞেস করছে। আমি কোথায় যাচ্ছি ওরা কি জানে?

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, যাবো।'

মাঝিদের মধ্য থেকে একজন বলল, 'কই যাইবেন?'

'মুরাদপুর যাব। যাইবেন আমাকে নিয়ে?'

কয়েকজন মাঝি একসঙ্গে বলল, 'যামু,যামু।'

আমি একজন । আমাকে নিয়ে যেতে চাইল কয়েকজন মাঝি। এতজনের নৌকায় কীভাবে যাবো?

আমি একটা নৌকায় উঠে পড়লাম। অন্য মাঝিদের জন্য আমার বেশ মায়া হল। ওরা সবাই আমাকে দেখে হয়তো আশা করেছিল ওদের নৌকায় আমি যাত্রী হব। কিন্তু সবার নৌকার যাত্রী হওয়া কি সম্ভব?

নৌকায় উঠে আমি মাঝিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাড়া কত দিতে হবে আপনাকে?'

মাঝি বেশ বিনয় করে আমাকে বলল, 'ভাইজান, আমরা সবসময় এখান থেকে মুরাদপুর খেপ লইয়া যাই তিরিশ টেহা। আপনি আমারে তিরিশ টেহা দিয়েন।'

মাঝির কথা শুনে আমার বেশ ভাল লাগল।

আমি বললাম, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। তা-ই দেব।'

একটু এগিয়ে নৌকায় পাল তুলে দিল মাঝি। এখন বাতাসে বেশ বেগ আছে। দোকানদার বলেছে, বাতাসে বেশি বেগ থাকলে মুরাদপুর পৌঁছাতে বেশি দেরি লাগবে না।

জলের বুক চিরে কল্ কল্ শব্দ তুলে দ্রুত ছুটে চলেছে নৌকা। একটু সামনে এগিয়ে যাবার পরে চোখে পড়ল বিরাটকায় এক বিল। বিলের মাঝ দিয়ে ছুটে চলেছে নৌকা। চারপাশে নিরব, নির্জন। শুধু জলের একটানা কল্ কল্ শব্দ। আকাশের কালো মেঘগুলো যেন ডুবে আছে বিলের পানির নিচে। সামনে তাকালে দেখা যায় আকাশ আর গ্রামের সবুজ বৃক্ষের মিলন রেখা। ওই যে দূরে গ্রামের সবুজ বৃক্ষ আর আকাশের মিলনরেখা এই কি শূন্যতার শেষ সীমানা? না। শূন্যতার শেষ সীমানা এত কাছে হতে পারে না। শূন্যতা বিশাল, বিরাট। শূন্যতার কোনো শেষ সীমানা নাই। রুবা চলে যাওয়ার পরে আমার জীবনে যে শূন্যতা নেমে এসেছে এর কি কোনো শেষ সীমানা আছে? দশবছর পরেও তো এই শূন্যতার শেষ সীমানা খুঁজে পেলাম না।

বিলের পানিতে ফুটে আছে শাপলা ফুল। আমি হাত বাড়িয়ে একটা ফুল তুলে আনলাম। আকাশ ভরা কালো কালো মেঘ। বর্ষায় কখনো আকাশ মেঘহীন থাকে না। আলো ঝলমল নীল আকাশের বুকে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ায় ছেঁড়াখোঁড়া মেঘ। ভাসমান এসব মেঘ দেখলে মনে হয় পেঁজা তুলোর মতো হাল্কা। বাতাসে ভেসে বেড়ায় এদিক ওদিক।

আকাশে যেসব মেঘ ভেসে সূর্যটাকে ঢেকে রেখেছিল এখন সেগুলো সূর্যের ওপর থেকে সরে গেল। রৌদ্রময় সূর্যের আলো বিলের পানিতে পড়ে সোনালী রশ্মির মতো মনে হল দেখতে। মেঘ আর সূর্যের আলো-ছায়াময় মোহনীয়, এসময় আমাকে নিয়ে যাচ্ছে মুরাদপুর। অদূরেই মুরাদপুর গ্রাম। ক্রমেই আমার নৌকাটা সেদিকে এগিয়ে চলছে।

রুবার স্বামীর বাড়ির সামনে আমি নৌকা থেকে নামলাম। মাঝির ভাড়া মিটিয়ে আমি ভেতরের দিকে হাঁটতে লাগলাম ধীর পায়ে। এ মুহূর্তে বাড়িটা আমার কাছে বেশ নিঝুম, নিভৃত মনে হল। যেন বাড়ির কোথাও কেউ নেই। আমি এগিয়ে গেলাম সদর দরজার দিকে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নক করার আগে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, কেউ যদি এখন আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'কাকে চাই?'

তখন আমি কী বলব? এ সময়ে একটা বুদ্ধি এলো মাথায়। কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে কাকে চাই? তখন আমিও ওল্টো তাকে জিজ্ঞেস করব, 'শওকতদের বাড়ি কোন্‌টা?'

শওকত নামের এই গ্রামের কোন মানুষকে আমি আদৌ চিনি না। আসলে এই গ্রামের কারো সঙ্গেই আমার কোনো পরিচয় নেই। আমি একথা বলব অন্য একটা উদ্দেশ্যে। কথাটা আমি একটু জোরে বলব। তখন হয়তো আমার গলার আওয়াজ শোনে রুবা বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে। আমি দেখতে পাব রুবাকে। দেখতে পাব ওর চোখ দু'টো। "শুধু ও দুটি চোখ, শুধু ও দুটি চোখ দেখতে এতদূর ছুটে এলাম... ।"

কিন্তু রুবা কি আমার গলার আওয়াজ শোনে বেরিয়ে আসবে? ওকি আমার গলার আওয়াজ শোনে বুঝতে পারবে যে আমি এসেছি? জানি না। হে খোদা! রুবা যেন আমার গলার আওয়াজ শোনে বুঝতে পারে। বুঝতে যেন পারে ওকে একবার দেখার জন্য আমি এতদূর ছুটে এসেছি।

আমি কয়েক পা এগুলাম দরজার দিকে। আমার মনে এখন দ্বিধা, সংশয়। আমি যেটুকু সামনে এগিয়েছি তার চেয়ে বেশি পেছনে ফিরে এলাম দ্বিধায়, সংশয়ে, ভয়ে। আমার দ্বিধা ও ভয়ের কারণ- রুবার সঙ্গে দেখা করতে আমার এইখানে, রুবার স্বামীর বাড়িতে চলে আসা কতটুকু উচিৎ হয়েছে আমি তা বুঝতে পারছি না। মনে হয় এটা আমার উচিৎ হয় নি। রুবার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা যদি আমাকে সন্দেহ করে তাহলে তো রুবার ক্ষতি হবে। এখন আমি কী করব? কুসুমপুরে ফিরে যাবো? এখন কুসুমপুর ফিরে যাবার নৌকা পাওয়া যাবে তো? রুবাকে একবার দেখার জন্য এতদূর ছুটে এলাম অথচ ওকে না দেখেই আমি ফিরে যাবো?

আমি সব দ্বিধা, সংশয় ও ভয়ের জড়তা উপেক্ষা করে এগিয়ে গেলাম সদর দরজার দিকে। দরজার সামনে একটু থেমে নক করলাম। কিন্তু ভেতর থেকে কোন সাড়া পেলাম না। আবার নক করতে যাব ঠিক এ সময় বাড়ির ভেতর থেকে আঠারো-কুড়ি বছর বয়সের একজন ছেলে বেরিয়ে এলো। ছেলেটাকে দেখে আমি থমকে দাঁড়ালাম। আমার বুকের ভেতরটা করে কাঁপতে লাগল দ্বিধায়, সংশয়ে, ভয়ে।

ছেলেটা এসে বারান্দার রেলিং ছুঁয়ে দাঁড়ালো।

আমি এখন কী করব? রুবার কথা জিজ্ঞেস করব ওকে? এটা রুবার স্বামীর বাড়ি। ওর কথা জিজ্ঞেস করলে ওরা আমাকে সন্দেহ করবে না তো? কোনো ক্ষতি হবে না তো রুবার? আমার কারণে রুবার কোনো ক্ষতি হোক আমি তো কখনোই চাই না।

ছেলেটা বারান্দায় দাঁড়িয়ে এতক্ষণ আমাকে দেখছিল। আমাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ইতঃস্তত করতে দেখে ও এগিয়ে এলো আমার কাছে। এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চান?'

আমি কোনো দ্বিধা, সংশয় ও জড়তা না করে সরাসরি ছেলেটাকে বললাম, 'রুবা আছে?'

ছেলেটা বলল, 'আপনি রুবার কে হন?'

আমি চুপ করে রইলাম।

আমি কে হই রুবার?

ছেলেটা ফের জিজ্ঞেস করল, 'কে হন আপনি রুবার?'

আমি বললাম, 'ইয়ে মানে- আমরা একসঙ্গে লেখাপড়া করেছি।'

'অ, তাই।'

'আপনার পরিচয়টা যদি জানতাম।'

'আমি রুবার ছোটভাই। রুবা আমার ভাবী।'

'রুবা কি আছে?'

'না ভাই, ভাবী নেই।'

'নেই?'

'না। আমাদের ভবানীপুরের বাড়ির কথা জানেন না মনে হয়। ভাইয়া ও ভাবী আজ তিন বছর হল ওই বাড়িতে উঠেছেন। আমরা আছি এ বাড়িতে।'

আমি মনে মনে ভীষণ নিরাশ হলাম। নিরাশায় কাতর হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে। এ সময়ে বাড়ির ভেতর থেকে একটা বয়স্কা মহিলার গলার আওয়াজ ভেসে এলো, 'কে এসেছে শাকিল? দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিস কেন? ভেতরে নিয়ে আয়।'

'আসছি।' ছেলেটা বাড়ির ভেতরের কণ্ঠটাকে জবাব দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ফের বলল, 'আসুন ভেতরে আসুন।'

আমি বললাম, 'না। ভেতরে যাব না। চলি।'

'সেকি চলে যাবেন কেন? আপনি ভাবীর পরিচিত। ভাবী নেই বলে কী হয়েছে। আমরা তো আছি। আসুন। এভাবে দরজার সামনে থেকে চলে যাবেন তা কী করে হয়?'

'না। আমার একটু তাড়া আছে। এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, রুবার সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। আসলে অনেকদিন ধরে ওর সঙ্গে দেখা হয় না তো!'

'আপনি ভাবীর সঙ্গে কোন সময়ে পড়েছেন, স্কুলে নাকি কলেজে?'

'কলেজে।'

'ইন্টারমিডিয়েটে পড়ার সময়ই তো বিয়ে হয়ে গিয়েছিল ভাবীর।'

'হ্যাঁ। ওর বিয়ে হওয়ার পর থেকেই আর দেখা হয় নি।'

'তাই?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। আসুন ভেতরে।'

'না আমি ভেতরে যাব না। বরং আমি চলি।'

'ভাবীকে কিছু বলতে হবে?'

'না।'

'ভাবী যদি জানতে চায়, কে এসেছিল তখন কী বলব? আপনার নামটা বলে যান।'

'আমার নাম জাহিদ, আসি।' এই বলেই আমি রুবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগলাম উদভ্রান্তের মতো। হাঁটতে গিয়ে আমি বারবার টলে পড়লাম। আমার চোখের সামনের সবকিছু সাদা মনে হতে লাগল।

আমি কুসুমপুর ফিরে এলাম সূর্যডোবা সন্ধ্যায়। নৌকায় নয়, ফিরে এলাম রিক্শায় চড়ে। রিক্শা আমাদের বাড়ির সামনে আসতেই আমাদের বাড়ি ভরা অনেক মানুষের কোলাহল চোখে পড়ল। ব্যাপার কী? আমাদের বাড়িতে এত মানুষ কেন?

আমি বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখি পাড়া প্রতিবেশী সবাই ছুটে এসে আমাদের বাড়িতে। শ'তিনেক মানুষের সমাগমে গমগম করছে পুরো বাড়ি। মানুষের ভিড় ঠেলে আমি সামনে এগিয়ে গেলাম। মা আমাকে দেখে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। মায়ের কান্না দেখে আমি আতঙ্কিত হলাম। মাকে বললাম, 'কী হয়েছে মা?'

মা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'সর্বনাশ হয়েছে বাবা, সর্বনাশ হয়েছে!'

'কেঁদো না মা। আগে আমাকে বলো হয়েছে কী?'

'তোর বাবা স্ট্রোক করেছে।'

'বলো কী মা? বাবা এখন কোথায়?'

'তোর মামা এসে হাসপাতালে নিয়ে গেছে।'

আমি এক সেকেন্ডও আর দাঁড়ালাম না এখানে। রিক্‌শা নিয়ে দ্রুত ছুটে চললাম হাসপাতালের দিকে। হাসপাতালে পৌঁছে দেখি সাদা বিছানায় নিথর, নিঃশব্দে শোয়ে আছে বাবা। মামা বসে আছে বাবার পাশে। মামা আমাকে দেখে কেঁদে উঠল। আমি আতংকিত হলাম। মামাকে বললাম, 'মামা, ডাক্তার কী বলেছে?'

মামার মুখে কিছু না বলে আমাকে হাত ধরে টানতে টানতে বাবার সামনে থেকে বাইরে নিয়ে এলো। বাইরে এসে আমি মামাকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'মামা, কী বলেছে ডাক্তার ?'

মামা এবার আর চোখের পানি ধরে রাখতে পারল না। বাঁধ ভাঙ্গা জলের মতো অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল মামার চোখ থেকে। কাঁদতে কাঁদতে মামা আমাকে কিছু ডাক্তারি রিপোর্ট দেখাল। রিপোর্টগুলো দেখে আমি খুব নার্ভাস হয়ে পড়লাম। আমার ইচ্ছে হল বাবাকে জড়িয়ে ধরে এখন খুব জোরে জোরে কাঁদি। যেভাবে কাঁদতাম ছোট বেলায় বাবার কোলে উঠে।

আমি ডাক্তারের রুমে গেলাম ওর সঙ্গে দেখা করতে। ডাক্তার আমাকে বলল, 'দেখুন, জন্ম-মৃত্যু সব আল্লাহর হাতে। মানুষের করার কিছু নেই। আপনি ওনার ছেলে। ভেঙ্গে পড়বেন না। সবকিছু মেনে নেওয়ার চেষ্টা করুন।'

আমি সত্যি সত্যি ভেঙ্গে পড়লাম না। ভীষণ কঠিন হলাম। কেন জানি আমার মনে হল, ডাক্তারের ওসব রিপোর্ট সত্য নয়, মিথ্যে, ভুল। জন্ম-মৃত্যু যদি আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে ডাক্তার কী করে আমার বাবার জীবনের নির্দিষ্ট সময় সীমা বেঁধে দিতে পারে? এসব ভুল, ভুল, ভুল, মিথ্যে। আমার বাবা বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে। আমাকে, আমার মাকে, আমার বোনকে ছেড়ে যাবার সাধ্য কি বাবার আছে? সেই পথ যে আমরা বন্ধ করে রেখেছি আমাদের শ্রদ্ধা দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, আমাদের রাগ, অনুরাগ, আমাদের অভিযোগ, অনুযোগ আমাদের মমতা ও আবদার দিয়ে। বাবা আছে, থাকবে। দুদিন পর বাবাকে হাসপাতাল থেকে বাসায় নিয়ে এলাম। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে বাবা আগের মতো স্বাভাবিক জীবন-যাপন থেকে কিছুটা অন্যরকম হয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দিতে লাগল দিনরাত্রি। ঘুমোয় না, ঠিকমত খায় না।

বাবা ঘুমোতে পারে না। ঘুমানোর জন্য সবরকমের চেষ্টা করা হল। কিন্তু বাবা যেন জনমের অতন্দ্র হয়ে গেছে। ঘুমের কড়া ড্রাগ হাল্কাভাবে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে শুধু। তা-ও কিছুক্ষণের জন্য। দিনের বেলায় তো বটেই, তাছাড়া সারারাত জেগে থাকে বাবা। বাবার এই ঘুমাতে না পারা দেখে আমি মনে মনে কাঁদি। একদিন তো বাবা ঘুমোবেই। এই তো অল্প কিছুদিনের মধ্যে চলে আসবে সেই চির ঘুমের দিনটি। যে ঘুম আর কোনো দিনই ভাঙ্গবে না।

রাতে আমি বাবার ঘরে এলাম। বাবা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে নিরিবিলি। ঘুমোয় নি। মা বসে আছে পাশে। আমি বাবার কাছে ধীর গলায় বললাম, 'বাবা, আল্সারটা প্রায় সেরে এসেছে। তবু ডাক্তারকে একবার দেখানো দরকার। ডাক্তারের রিপোর্ট পেলে নিশ্চিত হওয়া যায়।'

আমার কথা শোনে বাবার মাঝে কোন উৎসাহ দেখতে পেলাম না। আগের মতোই নির্বিকার বসে রইল বাবা। আমি ফের বললাম, 'তোমার কি মন খারাপ, বাবা?'

বাবা এবার একটু নড়ে চড়ে বসল। একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে বেশ ভারি গলায় বলল, 'হ্যাঁ। তবে তোরা ভাবিস নে যে আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে আমার মন খারাপ হয়েছে। আমার মন খারাপ হয়েছে তোদের এমন অভিনয় দেখে। কী নিখুঁত অভিনয় করে চলেছিস তোরা সবাই আমার সঙ্গে!'

আমি চুপ করে রইলাম।

বাবা ফের বলতে লাগল, 'শোন বাবা! ডাক্তারের সঙ্গে ফিসফিস গোপন আলোচনা করে তোরা সবাই মিলে রিপোর্ট গোপন রাখলে কী হবে? আমার কাছে ব্যাপারটা মোটেও গোপন নেই। আমি তো একেবারে মূর্খ নই রে। আমি তো তোদের লেখাপড়া জানা বাবা। আসল সত্য কথাটা তোরা সবাই মিলে আমার কাছে কেন লুকোতে চাচ্ছিস? তোরা কি ভাবিস আমি কিছুই বুঝি না!'

আমি বললাম, 'কী বলছ এসব যা তা, বাবা?'

'যা তা নয়, বরং যা তাই বলছি।'

'তুমি শুধু শুধু একথা বলছ বাবা। কোনো ভয় নেই আর। তুমি একদম ভালো হয়ে গেছ।'

'জাহিদ !' খুব আদর মাখা গলায় বাবা আমাকে ডাকলো।

'জ্বি, বাবা!' নরম গলায় সাড়া দিলাম আমি।

'এদিকে আয়।'

আমি বাবার কাছে গেলাম, খুব কাছে। বাবা আমার মাথায় হাত রেখে বলতে লাগল, 'ওই যে দেখ, দেয়ালের ঘড়ির কাঁটাটা এগিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

টিক টিক শব্দ হচ্ছে। ঘড়ির কাঁটাটা টিক টিক শব্দে শুধু এগিয়েই যাচ্ছে না। আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে, সময় চলে যাচ্ছে দ্রুত। এগিয়ে যাচ্ছে শেষের দিকে।'

আমি বললাম, 'চুপ করো বাবা। তুমি এখন ঘুমাও।'

বাবা বলল, 'ঘুম তো আসে নারে বাবা!'

'চেষ্টা করো। রাত প্রায় একটা বেজে গেছে। এত রাত অবধি জেগে থাকলে তোমার শরীর খারাপ করবে।'

মা এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন। আমার কথার সঙ্গে সঙ্গে মাও বলল, 'হ্যাঁ। বেশ রাত হয়েছে। এবার বিছানায় এসো। একটু ঘুমাও।'

বাবা বলল, 'ঠিক আছে। জাহিদ, তুই যা। ঘুমো গিয়ে। এই তো আমি এখনই শুয়ে পড়ছি।'

আমি আমার ঘরে চলে এলাম।

সকালে আবার বাবার কাছে ছুটে এলাম। এসে বাবার খুব কাছে বসে জিজ্ঞেস করলাম, 'আজ কেমন আছো বাবা?'

বাবা নির্বিকার গলায় বলল, 'ভালো।'

'রাতে ঘুমিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, ঘুমিয়েছি।'

'সত্যি বলছ?'

'মরণ পথের যাত্রী হয়ে মিথ্যে বলব, তু-ই বল!'

'আজ দুপুরে কি দিয়ে খাবে বলো?'

'কী খেতে পারি?'

'ডাক্তার বলেছে কোন বারণ নেই। তুমি যা খেতে চাইবে তা-ই খেতে পারবে।'

'কোন বারণ নেই কেন? শেষ খাওয়া বলে?' বলেই বাবা কাঁদতে লাগল। শিশিরের মতো ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল বাবার দু'চোখ বেয়ে। কাঁদতে কাঁদতে বাবা ফের বলল, 'আমিও তা বুঝতে পেরেছি। ডাক্তার খাবারের ব্যাপারে আর কোন ব্যরণ করবে না।'

বাবা কাঁদতে লাগল। আমার চোখেও নেমে এলো জল। আমি আমার কান্নাকে, আমার চোখের জলকে বাবার চোখের আড়াল করে রাখলাম। হঠাৎ আমার মনে পড়ল বাবা সকালের ঔষধ খায় নি।

আমি বললাম, 'বাবা, ঔষধ খেয়ে নাও।'

বাবা বলল, 'না রে, এখন আর অষুধটষুধ কিছুই খাব না। আমার ভীষণ খারাপ লাগছে। তুই বরং ফ্যানের স্পীডটা বাড়িয়ে দিয়ে এখান থেকে চলে যা। আমি এখন তোর মায়ের সঙ্গে কিছু কথা বলব।'

আমি ফ্যানের স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে আমার ঘরে চলে এলাম। এখানে এসে আমার একটুও ভালো লাগল না। কেন জানি, বারবার বাবার মুখটা, বাবার চোখের কোণে জমে থাকা শিশিরের মতো অশ্রুকণাগুলো আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে মায়ের চিৎকার শুনতে পেলাম। আমি দৌড়ে ছুটে গেলাম বাবার কাছে। গিয়ে দেখি আমার বাবা নেই। নীরব, নিস্তব্দ হয়ে গেছে বাবা চিরতরে। বাবাকে জড়িয়ে ধরে মা চেঁচিয়ে কাঁদছে। মায়ের চিৎকার শোনে পাড়াপ্রতিবেশী সবাই ছুটে এলো আমাদের বাড়িতে। আমার ছোট বোন কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ল। বাবা টান টান হয়ে শুয়ে আছে হা করে। কয়েকজন মিলে বাবাকে দক্ষিণ দিকে পা আর উত্তরে মাথা রেখে শুইয়ে দিল। ধবধবে সাদা কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হলো বাবার সারা দেহ। আগর বাতি জ্বেলে দিল কে যেন। কয়েকজন ছেলে-মেয়ে বাবার চারপাশ ঘিরে বসে কোরআন শরীফ পড়তে লাগল। মুহূর্তের মধ্যেই হয়ে গেল এসব। আমি নির্বিকার শুধু চেয়ে রইলাম। সবকিছূই হলো আমার চোখের সামনে।

দুপুর বেলায় মসজিদের মাইকে ঘোষণা করা হলো, 'একটি শোক সংবাদ। কুসুমপুর নিবাসী মোঃ আজহার উদ্দিন মাষ্টার আজ সকাল সাড়ে সাতটায় ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। মরহুমের জানাযার নামায আজ দুপুর দুইটায় তাঁর নিজ বাড়িতে অনুষ্ঠিত হবে...।'

এ পৃথিবীর রাজা...

আমি বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে বসে শূন্যের দিকে তাকিয়ে আছি আনমনে। এখন নিজেকে একটা হতচ্ছাড়া ব্যতিত আর কিছু মনে হলো না আমার। এ দেহটাকে মনে হলো একটা বিরাট বোঝা। এই বোঝা জন্ম থেকেই বয়ে এসেছি। বয়ে যেতে হবে আজন্মকাল। সঁপে দেওয়া হবে না কারো কাঁধে। না জীবনে, না মরণে। বিরাট এই বোঝা বয়ে বেড়াতে বেড়াতে এর চাপে ভীষণ দূর্বিপাকে আমার বুকের ভেতরে আকুলিবিকুলি করে কাঁদে সে অদৃশ্য পদার্থ, যাকে লোকে বলে মন।

জীবনে কী পেলাম? পৃথিবী কী দিল আমাকে? না পারলাম রাজা হতে, না হলাম ভিখিরী। আমার রাজা হতে না পারা ও ভিখিরী না হওয়ার মাঝখানে কিন্তু কোনো পূর্ণতা নেই। জীবন জুড়েই আছে শূন্যতা, অপূর্ণতা। তবু বেঁচে থাকার আশায় নতুন স্বপ্ন দেখার উৎসাহ জিয়েই রাখতে হবে জীবনে। সব

শূন্যতা, সব অপূর্ণতা ঘোচাতে হবে শ্রম দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে। হঠাৎ কারো কোমল হাতের স্পর্শ পেলাম। বরফের চেয়ে শীতলতা অনুভূত হলো আমার দেহ ও মনে। তাকিয়ে দেখি মা এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে। আমার মাথায় হাত রেখে গভীর মমতা জড়ানো গলায় মা আমাকে বলল, 'এভাবে এখানে একা বসে আছিস যে! সকাল থেকেই তো কিছু মুখে দিস নি। চল খাবি?'

আমি শূন্যের দিকে তাকিয়েই রইলাম, 'না মা, আমি কিছুই খাব না এখন।'

'খাবি না কেন?'

'ক্ষিধে নেই।'

'ক্ষিধে নেই। সকালে তো কিছুই খাস নি। এখন সকাল গড়িয়ে প্রায় দুপুর হয়ে এলো অথচ তুই বলছিস ক্ষিধে নেই। চল খাবি চল।'

'মা আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'খেতে ইচ্ছে করছে না কেন? বাবার জন্য মন খারাপ করছে বুঝি?'

আমি চুপ করে রইলাম। বাবার জন্য আমার মন খারাপ করছে না। সত্যি বলছি। আমি শোক করছি না, কাঁদছি না, অশ্রুও ফেলছি না চোখ থেকে এক ফোঁটা, অথচ বাবার মৃত্যুতে যে শোক, যে শূণ্যতা সৃষ্টি হয়েছে আমার জীবনে তা মেনে নেওয়া খুবই কঠিন। কোনো প্রবোধ বা সান্ত্বনা বাক্যে নিজেকে শান্ত করা সম্ভব নয় শুধু, একেবারে অসম্ভব মেন হল।

মা ফের বলল, 'ও তো চলেই গেছে। ওর জন্য না খেয়ে না ঘুমিয়ে তুই নিজেকে শেষ করে দিবি না-কি! তুই ছাড়া আমার আর কে আছে, বল। তুই যে আমার আশার আলো, আমার সাত জনমের সাধনার ধন। আয় বাবা, কিছু খেয়ে নে!'

আমি আর বসে থাকতে পারলাম না। খেতে চলে এলাম। আমার এই চরম শূন্যতা ও অপূর্ণতার মধ্যেও আমার মায়ের স্নেহস্পর্শ পেয়ে নিজেকে এখন ভীষণ তৃপ্ত ও পরিপূর্ণ মনে হল। মনে হল, পৃথিবী আমাকে কম দেয় নি। হয়তো আমাকে এর চেয়ে বেশি দেবার সাধ্য বা ক্ষমতা নেই পৃথিবীর ।

আমি রাজা হতে পারিনি বটে। আমি তো আমার মায়ের আশার আলো হতে পেরেছি। এই আমার রাজা হওয়া। আমার মাকে নিয়েই আমার রাজ্য বিস্তৃত। আমার এ রাজ্য বিরাট ও বিচিত্র।

আমার বাড়ির নিম গাছের ডালে ডালে পাখিদের কল-কাকলী শোনে মনের বিষণ্নতা দূর করে দিয়ে একটা প্রশান্তির আবেশ জাগিয়ে তোলা- এই আমার রাজ্য।

ফুলের বাগানে ফুটন্ত অনাঘ্রাত ফুলের গন্ধ ও সৌরভে মন ভরে উঠা- এই আমার রাজ্য।

আঁকা-বাঁকা মেঠো পথে হেঁটে হেঁটে প্রাণভরে মাঠের নতুন ধানের সজীব গন্ধ শোঁকা- এই আমার রাজ্য।

আবীরে রাঙা উদাস গোধূলি বেলায় নদীর নির্জন তীর থেকে ভেসে আসা রাখালিয়া বাঁশির সুর- এই আমার রাজ্য।

বিস্মৃতির খেয়ায় ভেসে ভেসে রুবার স্মৃতির জাবর কাটা- এই আমার রাজ্য।

মায়ের সঙ্গে মাদুর পেতে বসে জামবাটি ভরে দুধ-কলা ও বনের সু-স্বাদু ফল খাওয়া- এই আমার রাজ্য।

আমার মনটা এখন বড় শান্ত ও লক্ষ্মী হয়েছে। জীবনের পাওয়া না পাওয়ার হিসেব গিয়েছে চুকে। মন আমার হয়তো বুঝে ফেলেছে, জীবনে প্রত্যাশার শেষ নেই। নেই স্বপ্নের কোনো শেষ সীমানা। মনকে আমার ধন্যবাদ।

আমি রাজা হতে পারি নি। হতে পারি নি যাত্রাপালার নায়ক কিংবা ক্রিকেট খেলোয়াড়, হতে পারি নি হিরো উত্তম কুমারের মতো। এজন্য আমার কোনো দুঃখ নেই, ক্ষেদ নেই, নেই কোনো আফশোস। আমি আমার মায়ের আশার আলো হতে পেরেছি এই আমার জীবনের চরম সার্থকতা। আজ অনেক সুখে, অনেক আনন্দে চিৎকার করে, আকাশের দিকে মুখ করে, চারপাশে ধ্বনি, প্রতিধ্বনি তোলে বুকের গহ্বর থেকে বলতে ইচ্ছে করে, 'আমি এ পৃথিবীর রাজা!'

সে চলে গেছে বলে কি গো...

মা বলল, 'তোর ফোন এসেছে জাহিদ।'

বিকেলটা আজকাল বই পড়েই কাটে আমার। বারান্দায় খোলা ব্যালকনিতে প্রিয় বেতের চেয়ারটাতে হেলান দিয়ে বসে বই পড়া যায় আয়েশ করে। আজ বসেছি হাতে নিয়ে 'মির্চা এ্যালিয়াদের "লা লুই বেঙ্গলি"। বইটি আরো কয়েকবার পড়েছি। ভীষণ ভালো লেগেছে বলে আরো একবার পড়তে ইচ্ছে হল।

ড্রয়িং রুমে আমাদের টেলিফোন রাখা।

আমি আলতোভাবে রিসিভার তোলে বললাম, 'হ্যালো।'

ওপাশ থেকে একটা মেয়েলি গলা ভেসে এলো, 'এটা কি সেভেন টু ফাইভ থ্রি সেভেন সিক্স...।'

'হ্যাঁ, কাকে চাচ্ছেন?'

'যার সাথে কথা বলছি, তাকেই।'

আমার মনে খটকা লাগল। অবাকও হলাম কিছুটা। আমার কাছে সচরাচর কোন মেয়ের ফোন আসে না। আজ কে ফোন করল? কে হতে পারে এই ভেবে একটা অজানা কৌতূহল বিরাজ করতে লাগল আমার মাঝে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কে বলছেন?'

ওপাশ থেকে ভেসে এলো, 'কী ব্যাপার! তুমি কি আমাকে চিনতে পার নি, জাহিদ?

আমি আরো অবাক হলাম। মেয়েটা আমাকে চেনে, আমার নামও জানে অথচ আমি ওকে চিনতে পারছি না। কে মেয়েটা? আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কে বলছেন?'

মেয়েটা হাসল। আমি আরও অবাক হলাম।

মেয়েটা হাসি থামিয়ে বলল, 'তুমি কি আসলেই আমাকে চিনতে পার নি?'

আমি বললাম, 'না।'

'সত্যিই চিনতে পারিনি?'

'বললাম তো না।'

'আমার গলার স্বর শোনেও চিনতে পার নি?'

আমি এবার থেমে গেলাম। মেয়েটার গলার স্বর আমার কাছে কেমন চেনা চেনা মনে হল। মনে হল, অনেকদিন আগে এই কণ্ঠস্বর আমার খুব চেনা ছিল।

আমি বললাম, 'শুধু গলার স্বর শোনেই কাউকে চেনা যায়?'

মেয়েটা দৃঢ়ভাবে বলল, 'হ্যাঁ, চেনা যায়।'

'কীভাবে?'

'চিনে নিতে হয়।'

'কিন্তু আপনি পরিচয় দিচ্ছেন না কেন? আপনার পরিচয় দিন নইলে আমি ফোন রেখে দেব এখন।'

'রাখবে? তা রাখতে পারো। সেটা তোমার ইচ্ছে।'

কথাটা শেষ করতেই মেয়েটা একটা শ্বাস ফেলল। দীর্ঘশ্বাস। এতই দীর্ঘ যে মনে হল, ওর শ্বাসটা আমার বুকে এসে ধাক্কা লেগেছে।

আমি কোন কথা বললাম না। চুপ করে রইলাম। মেয়ে কণ্ঠটাও নীরব। কিছুক্ষণ নীরব থেকে কথা বলল মেয়েটা। ও এবার কথা বলল গলার স্বর নরম করে। বলল, 'জাহিদ, সত্যিই কি তুমি আমাকে চিনতে পারনি?'

আমি কোন কথা না বলে চুপ করে রইলাম।

মেয়েটা আবার বলল, 'এত সহজেই কি তুমি আমাকে ভুলে গেছ?'

আমার বুকের ভেতরটা এবার মোচড় দিয়ে উঠল। মেয়েটার গলার স্বর আমার কাছে এখন আর অচেনা লাগছে না। মনে হল, এই কণ্ঠ, এই কণ্ঠের প্রতিটি আওয়াজ আমার অনেক দিনের চেনা।

এ মেয়েটা রুবা নয়তো?

না রুবা কেন এতদিন পরে আমার কাছে আজ ফোন করবে? সে তো অনেক আগেই আমাকে ভুলে গেছে। জাহেদি নামে এ পৃথিবীতে কোনকালে কেউ ছিল কিনা তাও হয়তো মনে পড়ে না ওর। মনে পড়ার কথাও নয়। কারণ- সে আমাকে ভুলে গেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কে তা কি বলবেন না?'

মেয়েটা বলল, 'তোমার পরিচিত একজন।'

'নাম বলুন। নাম বলতে কী অসুবিধা?'

'না। কোন অসুবিধা নেই।'

'তাহলে নাম বলুন।'

'আমি রুবা। চিনতে পেরেছ আমাকে?'

আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। সোফার উপড়ে বসে পড়লাম ধপাস করে। আমার বুকের ভেতর যেন সিডরের চেয়েও ভয়ংকর ঝড় উঠল। নদীর পার ভাঙ্গার মতো আমার বুকের ভেতরটা ভেঙ্গে চুরে যেতে লাগল সেই ঝড়ের আঘাতে। রুবা এতদিন পরে হঠাৎ আজ কেন ফোন করল আমার কাছে?

আমি কিছুটা আবেগ মাখা গলায় বললাম, 'রুবা তুমি কেমন আছ?'

রুবা বলল, 'ভালো। তুমি কেমন আছ জাহিদ?'

'ভালো।'

'শোন জাহিদ?'

'হুঁ, বলো।'

'এতদিন পরে আজ হঠাৎ আমি তোমার কাছে ফোন করেছি বলে তুমি নিশ্চয়ই অবাক হয়েছ, তাই না?'

'অবাক হয়েছি বৈকি। সময় তো কম যায় নি। সুদীর্ঘ একযুগ, বারোটা বছর।'

রুবা চুপ করে রইল।

আমার মনে সেই প্রশ্নগুলো জেগে উঠল এবার। রুবার সাথে কখনো দেখা হলেই যা ওকে জিজ্ঞেস করব বলে বুকের ভেতর পোষা পাখির মত নিভৃতে লালন করে এসেছি এতকাল। কিন্তু এ মুহূর্তে মুখ ফুটে একটাও বলতে পারছি না। কেন বলতে পারছি না? কারণ এসব কথা ফোনে বলা যায় না। এসব কথা আমি ওর মুখোমুখি বসে, ওর চোখে চোখ রেখে বলতে চাই। ওকে আমি মাথা

ছোঁয়ায়ে, বুকে হাত রেখে হলফ করিয়ে বলতে চাই-ওর সাথে কি আমার এরকম কথা ছিল? ওর সাথে আমার কথা ছিল অন্যরকম। "কথা ছিল- এক তরীতে কেবল তুমি আমি যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে... ।"

রুবা বলল, 'হ্যালো, হ্যালো। তুমি কি শুনতে পাচ্ছো, জাহিদ?'

আমি বললাম, 'বলো শুনছি।'

'তোমাকে একটা অনুরোধ করব। তুমি রাখবে?'

'কী ব্যাপার?'

'আগে বল রাখবে?'

'তুমি বলো। রাখার হলে রাখব।'

'সত্যিই রাখবে?'

'বললাম তো রাখার হলে.... ।'

'প্রমিজ?'

'প্রমিজ করতে হবে? কী এমন অনুরোধ শুনি?'

'আগে বলো- প্রমিজ তুমি রাখবে?'

'বেশ প্রমিজ করলাম, রাখব। এবার বলো, কী ব্যাপার?

'সময় করে তুমি একদিন আমার বাসায় আসবে? হয়তো তুমি এখন খুব ব্যস্ত। হাতে তোমার সময় নাও থাকতে পারে, এটা মানি। তবুও আমি যখন তোমাকে অনুরোধ করেছি, আসবে তুমি আমার বাসায়? কতদিন তোমাকে দেখি না!'

রুবার কথা শুনে আমি ভীষণ অবাক হলাম। এতদিন পরে আমাকে ওর বাসায় যেতে বলেছে। আমি অবাক হলাম ওর গলার স্বর শোনে। কী রকম পাল্টে গেছে ওর গলার স্বর। আহ! ওর গলার স্বরে সেই চির চেনা মধুরতা আর নেই।

রুবা ফের বললো, 'চুপ করে আছ যে! বলো তুমি আসবে?'

আমি বললাম, 'কী হবে এসে?'

'কিছুই হবে না। এই একটু গল্প করব। তোমাকে কাছে থেকে দেখব। কতদিন দেখি না তোমাকে!'

একদা এমন এক সময় ছিল- যখন আমি রুবাকে একদিন না দেখলে আমার চোখের সামনে সবকিছু সাদা মনে হত। আজ এতদিন, এতকাল পরে রুবা কি সেই আগের মত আছে? রুবার সেই টান টান শরীর, পলকহীনভাবে চেয়ে থাকার মত দু'চোখ, মসৃন গাল, লাল ঠোঁট আর দীঘল কালো চুলের অপরূপা সেই রুবা কি এখনো আছে? কেন জানি, হঠাৎ ওকে দেখার জন্য আমার ও ভীষণ ইচ্ছে হতে লাগল।

আমি রুবাকে কথা দিলাম।

রুবা যারপর নাই খুশি হয়ে নিজের বাসার ঠিকানা বলে ফোন রেখে দিল। ও ফোন রেখে দেওয়ার পরেও আমি কানের কাছে রিসিভার ধরে বসে রইলাম কিছুক্ষণ।

আজ থেকে বারো বছর আগে আমি রুবাকে হারিয়েছি। হারিয়েছি বললে ভুল হবে। হারিয়ে ফেলেছি বললেও নিজের ওপরেই দায় বর্তায়। বলতে পারি- হারিয়ে গেছে রুবা। ওযে হারিয়ে গেছে প্রায় বারো বছর হতে চলেছে। ওকে হারিয়ে আমি একটা দিন, একটা রাত এমনকি একটা মুহূর্তেও ওকে মন থেকে সরাতে পারিনি। ওর জন্য আমার বুকের বাঁ পাশে, একেবারে হৃৎপিণ্ডের মাঝখানে একটা চিনচিনে ব্যথা অনুভব করি সর্বক্ষণ। কখনো কখনো ব্যথাটা একবারে সহ্য করতে পারিনা। ভীষণ অসহনীয় মনে হয়। মনে হয়, কে যেন বুকের ওপর দিয়ে লাঙ্গল চালিয়ে বুকটা আমার ফালা ফালা করে দিয়ে গেছে।

আজ থেকে বারো বছর আগের কোন একদিন রুবা কলেজের জারুলতলার সবুজ দূর্বাঘাসে বসে আমাকে বলেছিল, 'জাহিদ তোমাকে আমি খুব ভালবাসি। তোমাকে ছাড়া আমি কিছুই ভাবতে পারি না। তোমার জন্য আমি সবকিছু করতে পারি।'

আমি বলেছিলাম, 'সবকিছু করতে পারো? তা কী কী করতে পার, শুনি?'

রুবা তখন কবি হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, 'তোমার জন্য আমি অসীম শূন্যে উড়তে পারি, হতে পারি শঙ্খচিল। মেঘের শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে দূরের ঐ আকাশ থেকে টুকরো টুকরো নীল আনতে পারি। আফ্রিকার গভীর অরণ্যে স্বেচ্ছায় নির্বাসন যেতে পারি। বসতভিটে ফেলে মিশরের পিরামিডে করতে পারি দিনযাপন।'

আমি ওর কথা শোনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। খুশিও হয়েছিলাম ভীষণ। রুবা বেশ সুন্দর করে কথা বলতে পারত। ও কথা বললে মনে হতো কবিতা আবৃত্তি করছে। আজ এতদিন পরে রুবা কি সেসব কথা মনে আছে? হয়তো মনে নেই। হয়তো মনে আছে। সেসব কথা ওর মনে থাকুক আর নাইবা থাকুক আমি মোটেও ভুলি নি। ভুলতে পারি নি। ভুলব কেমন করে? রুবার মুখটা প্রথম দেখাতেই সেই যে বুকের গহীনে খোদাই করেছিলাম আজও তেমনই আছে। থাকবে চিরদিন। কখনো ভুলব না আমি রুবাকে। ভুলব না ওর হাসিমাখা মুখটা। ওর সেই দু'টো চোখ, ফুলঝরা সেসব কথা। ভুলব না ওর স্মৃতি। "সে চলে গেছে বলে কি গো স্মৃতিও তার যায় ভোলা...।"

রুবার কি সেসব কথা মনে আছে। সেই যে কলেজ, ক্যাম্পাস, জারুলতলা, কদমতলা, মনে আছে কি ওর? ওকি জানে সেই দিনগুলোর কথা মনে করে করে আমি যেন আজও সেই দিনগুলোতেই থেমে আছি। "আমার প্রথম দেখার সেই ক্ষণটিকে ভুলব কেমন করে? সে যে প্রতিদিনের রৌদ্র ছায়ায় আসে ফিরে ফিরে...।"

জানি সেই দিনগুলো আর ফিরে পাব না। ফিরে পাব না আর রুবাকেও। পাব কী করে? ও যে এখন অন্যজনের একান্ত একান্তে একাত্ম। অথচ একদিন রুবা বলেছিল, ও না-কি আমাকে ছাড়া বাঁচবে না। এ কথাটি মিথ্যে বলেছিল। কারণ- ও এখনো বেঁচে আছে এবং বেঁচে আছে আমাকে ছাড়াই।

বৃষ্টিভেজা সেই দিনটি ...

একজন মাঝবয়সী দারোয়ান গোছের লোক আমাকে বিনীত গলায় বলল, 'কাকে চান, স্যার?'

আমি লোকটাকে বললাম, 'এটাই তো রুবার বাড়ি, তাই না?'

'জ্বি।'

'রুবা আছে?'

'জ্বি স্যার। উনি ঘরে আছেন।'

'ধন্যবাদ।'

আমি রুবার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কলিংবেলটা টিপতে যাব ঠিক সেসময় আমার মনে হল, আমার হঠাৎ আঙ্গুল যেন অবশ হয়ে গেছে। আমার এমন হল কেন? দ্বিধায়? সংশয়ে? নাকি উত্তেজনায়?

হ্যাঁ, উত্তেজনায়। প্রবল উত্তেজনা এখন আমার মাঝে। কতদিন পরে রুবার সাথে আজ আমার দেখা হতে যাচ্ছে। একদিন বা একবছর নয়, দীর্ঘ বারোবছর পরে রুবার সাথে আজ দেখা হতে যাচ্ছে আমার। এখন উত্তেজনা হওয়াটা অস্বভাবিক কিছু নয়।

আমি আড়ষ্ট আঙ্গুলে কলিংবেলের বাটনটাতে চাপ দিলাম। পাখির ডাকের মত শব্দ হল ভেতরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজা খুলে দিল নিজেই রুবা। ও হয়তো আমার অপেক্ষায় বসেছিল ঘরে এতক্ষণ। দীর্ঘ বারোবছর পরে আমি দেখলাম ওকে। রুবা ঠিক আগের মতোই আছে। ওর চোখ দু'টো কেমন ফোলা ফোলা দেখাচ্ছে। মনে হয়, ও ঘুমিয়েছিল।

রুবা একপলকে আমাকে দেখে নিয়ে শান্ত গলায় বলল, 'এসো, ভেতরে এসো।'

আমি অনড়, নিঃশব্দ। শুধু তাকিয়ে আছি।

'কী হলো, ভেতরে এসো।' বলেই রুবা আমার হাত ধরে টান দিল।

আমি ধীর পায়ে ঘরের ভেতরে গেলাম।

ড্রয়িংরুমে পাশাপাশি দুটো সোফায় বসলাম আমরা। রুবার ড্রয়িংরুমটা বেশ সাজানো-গোছানো। আধুনিক আসবাবপত্র, দামি কার্পেট, টেলিভিশন, টেলিফোনসেট সবকিছুতেই আভিজাত্যের ছাপ বিদ্যমান। এই টেলিফোন থেকেই কি রুবা আমাকে ফোন করেছিল?

রুবা বলল, 'কী খাবে বলো, চা না কফি?'

আমি এখন কিছুই খাব না বলে জানালাম। তবে মুখে নয়, মাথা নেড়ে।

কিন্তু রুবা আমার এই খাইতে না চাওয়ায় মোটেও আমল দিল না। ও বসা থেকে উঠে গিয়ে চা-নাশতার কথা বলে এসে আবার আগের জায়গায় বসল। কিছুক্ষণ পরে কাজের মেয়ে চা-নাশতা দিয়ে গেল। নাশতা খেতে খেতে রুবা ফের বলল, 'তুমি কেমন আছো, জাহিদ?'

'ভালো।'

এই প্রথম কথা বললাম আমি।

একটু থেমে ফের বললাম, 'আমার কথা বাদ দাও। তোমার কথা বলো।'

'আমার কথা কী বলব?'

'তুমি কেমন আছো? তোমার স্বামী, সংসার ও সন্তান নিয়ে কীভাবে কাটছে দিন ইত্যাদি।'

আমি কোন কথা বললাম না আর। শুধু চুপ করে বসে সামনের দেয়ালের দিকে চেয়ে রইলাম নিরিবিলি। "যেন কাছের দিনের ছোঁয়াচ-পার হওয়া চাহনিতে...। কেন এসব কথা? এর চেয়ে অনেক ভালো চুপ করে থাকা...।"

রুবা বসা থেকে উঠল এবার। আমাকে বলল, 'চলো।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায়?'

'বাগানে গিয়ে বসব।'

'ঠিক আছে, চলো।'

আমি রুবার সঙ্গে গেলাম। ড্রয়িংরুমের সামনেই একটা খোলা জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে বাগানটা। বাগানে এসে দু'টো বেতের চেয়ারে মুখোমুখি হয়ে বসলাম দু'জনে। এমুহূর্তে রুবার পাশে বসে আমার মাঝে একটা ভালো লাগা আমেজ চলে এলো হঠাৎ। এখন বাগানটা বেশ সুন্দর মনে হল। ফুটন্ত ফুলের সুরভি, প্রজাপ্রতির ওড়াওড়ি, বয়ে চলা মৃদু-মন্দ বাতাস। সব মিলে নিজেকে বেশ হাল্কা, বেশ ফুরফুরে মনে হল।

রুবা আমাকে ডাকল, 'জাহিদ?'

আমি অকস্মাৎ চমকে উঠলাম। চমকে উঠার কারণ- রুবা এখন আমাকে যেভাবে ডাকল, বারোবছর আগে ঠিক এভাবেই ডাকত। আহ্! কী সুন্দর ছিল সেই দিনগুলির স্মৃতি? "বারো বছর আগের সেসব কথা... ।"

আমি রুবার ডাকে সাড়া দিলাম, 'হুঁ।'

ঠিক সেই সময় যেভাবে সাড়া দিতাম, সেভাবেই।

রুবা বলল, 'কিছু বলো? চুপ করে থেকো না।'

আমি বললাম, 'কী বলব? তুমি বলো, আমি শুনি।'

'আমি কী বলব, বলো?'

'তুমি তো এখন স্বামী-সংসার নিয়ে মহা সুখে আছ। তোমার কথা কি কখনো ফুরাবে?'

'আমি বর্তমানকে নিয়ে কিছু বলতে চাই না। অতীতকে নিয়ে কিছুটা সময় ভাবতে চাই এখন।'

'অতীত, মানে-যা চলে গেছে?'

'এভাবে বলছ কেন?'

'কী হবে সেইসব চলে যাওয়া দিনের কথা ভেবে, বলো?

'জাহিদ, "আমাদের গেছে যেদিন, একেবারেই কি গেছে, কিছুই কি নেই বাকি...?"

আমি চুপ করে রইলাম।

রুবা ফের বলল, 'একটা কথা বলতে পারবে তুমি, জাহিদ?'

আমি বললাম, 'কী কথা?'

রুবা বাগানের দিকে মুখ করে বলল, 'বৃষ্টিভেজা সেই দিনটির কথা কি তোমার মনে আছে?'

আমি ভীষণ আঁতকে উঠলাম। আমার বুকের নিচের মাংস খণ্ডটা-যার কারণে আমি সচল, এখন যেন সেটা অচল হয়ে গেছে। রুবা কখন যে আমাকে এই প্রশ্নটা করবে এতক্ষণ ধরে আমি সেই সংশয়েই ছিলাম। "কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে...!"

আমার মনে পড়ে সেই দিনটির কথা। দিনটি ছিল বৃষ্টিতে ভেজা। বৃষ্টি, মুষলধারায় বৃষ্টি। রুবার বেডরুমে আমি। এ মুহূর্তে আমি আর কিছুই মনে করতে পারছি না। উফ! কী লজ্জা পেয়ে সেদিন রুবার ঘর থেকে আমি বেরিয়ে গিয়েছিলাম!

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে রুবা বলল, 'চুপ করে থেকো না। কিছু একটা বলো।'

আমি শান্ত গলায় বললাম, 'এতদিন পরে ওসব পুরনো কথা তোলে কী হবে? যা হারিয়ে গেছে তা কি আর ফিরে পাব? এখন তুমি আমি দু'জনেই তো বেশ বদলে গেছি।'

যে আমি কলেজ জীবনের প্রায় অর্ধেক সময় রুবার সঙ্গে কাটিয়েছি। কখনো ওর মুখের দিকে তাকিয়ে, কখনো ওর হাত ধরে হেঁটে, কখনো রিকশায় চড়ে সারা শহর চষে বেড়িয়ে ।আজ সেই আমি এখন রুবার পাশে বসে আমার মনে হল, আহা! কি সুন্দর ছিল সেই দিনগুলি। "সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি... ।"

সময়কে যদি পেছনে ফিরিয়ে আনতে পারতাম। যদি পারতাম আমি সময়কে পেছনে ফিরিয়ে আনতে, তাহলে আমার যাপিত সময়গুলো কলেজের ক্লাশরুমে রুবা এবং আমার মাঝখানে এনে দাঁড় করিয়ে রাখতাম। যে সময়ে আমি রুবার মুখোমুখি বসে অনুভব করতাম অনন্তসুখ ।

কিন্তু তা একেবারেই সম্ভব নয়।

হঠাৎ একপশলা দখিনা বাতাস বয়ে গেল। বাগান থেকে ভেসে এলো অনাঘ্রাত ফুলের ঘ্রাণ। রুবা বাগানের দিকে মুখ করে উদাস গলায় বলতে লাগল, 'সেদিন তোমার সঙ্গে ওই অবস্থায় আমাকে দেখে কাজের মেয়েটা আমার মায়ের কাছে সব বলে দিয়েছিল। মা ব্যাপারটা আমাকে বুঝতে না দিয়ে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে কী যেন সিদ্ধান্ত নিল। আমি তখন কিছুই জানতে পারলাম না। জানতে পারলাম পরদিন-যখন দেখতে পেলাম কিছু গেস্ট এলো আমাদের বাসায়। আমি অবাক হয়ে মাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মা, ওরা কারা?'

মা বলল, 'দেখতে এসেছে তোকে?'

আমি ভীষণ মুষড়ে পড়লাম। অগত্যা সাজিয়ে ওদের সামনে পাঠানো হল আমাকে। ওদের পছন্দ হয়ে যাওয়াতে পাকা কথার পরে সাতদিনের মাথায় আমার বিয়ে ঠিক হল। তখন মুখ ফুটে কিছু বলার আমার সাহস ছিল না। তোমার কোন খোঁজও পাচ্ছিলাম না। সাতদিন পরেই আমার বিয়ে। তোমার সাথে যোগাযোগ করা আমার ভীষণ দরকার। কিন্তু আমাকে ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করা হল। ঘরের ভেতর একরকম আটকে রাখা হল আমাকে। মা কড়াকড়িভাবে আমাকে বলে দিলেন, 'বিয়ের আগে কোথাও যেতে হবে না তোকে। এমনকি কলেজেও না।'

আমি তোমার কাছে ফোন করার চেষ্টা করলাম। একবার ফোনও করেছি। কিন্তু তোমাকে পাওয়া যায় নি। আমি তখন নিরুপায় হয়ে আমার ছোট বোনটাকে বললাম, 'সুভা, একটু জাহিদদের বাসায় যেতে পারবি?'

পাকা বুড়ির মতো তখন আমার স্কুলপড়ুয়া বোনটা আমাকে বলল, 'ভুলেও তুমি ওর নাম মুখে এনো না। ওর কারণেই তো তোমার বিয়েটা এত তাড়াতাড়ি করে সাড়া হচ্ছে।'

তখন আর কিছুই করার ছিল না। তোমার সাথে যোগাযোগ করা তো দূরের কথা তুমি কোথায় আছো তাও জানতে পারি নি।

আমি বললাম, 'রুবা, তুমি এসব কথা কেন বলছ এখন? তুমি কি আমার কাছে কৈফিয়ত দিচ্ছো?'

রুবা বলল, 'না। তোমাকে জানাতে চাই।'

'কী আর হবে এসব জেনে, বলো, সময় অনেক বদলে গেছে এখন। বারো বছর আগের তোমার আমার সেই পৃথিবী আর নেই।'

'তুমি কি আজ অন্য প্রেক্ষিতে ভাবছো আমাকে?'

'মোটেও না। যদি তাই ভাবতাম তাহলে তোমার স্মৃতি লালন করে বেঁচে থাকতাম না দীর্ঘ বারোটা বছর। ফিরিয়ে দিতাম না একের পর এক আমার মায়ের পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব। হতাম না আমি চিরকুমার।'

রুবা যেন একটু অবাক হল।

'তুমি কি বলছ এসব যা তা?'

আমি শান্ত গলায় বললাম, 'যা তা নয়। বরং যা তাই বলছি আমি। কী চেয়েছিলাম আমি তোমার কাছে বলো? শুধু তোমার শরীরের স্বাদ? না, আমি তা চাই নি। তুমি হয়তো এতটা বছর আমাকে ভুলে থাকতে পার। আমি একদিন, একমুহূর্তের জন্যেও তোমাকে ভুলিনি।'

রুবা আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে। ও যেন আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে অপরাধ বোধ করছে এখন। আমিও রুবার মুখ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। দু'টো প্রজাপতি ওড়াওড়ি করছিল বাগানে। আমি সেদিকে তাকিয়ে রইলাম নিঃশব্দে।

হঠাৎ এ সময় সাত কিংবা আটবছর বয়সী একটা মেয়ে এসে রুবার কোল ঘেঁষে দাঁড়াল। মেয়েটা দেখতে অবিকল রুবার মতো। শেষ বিকেলের ম্লান আলো এসে যখন মেয়েটার মুখের ওপরে পড়ল তখন মনে হল, রুবার মুখটাই যেন মেয়েটার মুখের ওপরে বসানো। হুবহু মিল দু'জনের মুখে।

রুবা মেয়েটার মাথায় হাত রেখে বলল, 'আমার মেয়ে, নাম পুষ্পিতা।'

আমি বললাম, 'পুষ্পিতার বাবাকে দেখছি না যে? উনি কোথায়?'

রুবা মুহূর্তের মধ্যে মুখ ভার করে ফেলল। সে যেন আমার কথা শুনতে পায় নি এমন ভাব করে বসে রইল।

আমি আবারও জিজ্ঞেস করলাম, 'পুষ্পিতার বাবা কোথায়? কী করছেন তিনি?'

রুবা কিছু বলার আগেই হঠাৎ পুষ্পিতা বলে উঠল, 'আমার বাবা নেই। কবেই তো.... ।'

পুষ্পিতাকে আর বলতে না দিয়ে ওর মুখ চেপে ধরল রুবা। আমি হতবাক হয়ে মা-মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ।

আমি বসা থেকে উঠে পড়লাম। দাঁড়াতেই পা টললো আমার। নিজেকে সামলে নিয়ে আমি হাঁটতে লাগলাম। দুই তিন পা হেঁটে পেছন ফিরে দেখলাম মেয়ের মুখ চেপে ধরেই চুপ করে বসে আছে রুবা। আমি আবার হাঁটতে লাগলাম। দুই পা সামনে এগুতেই রুবা পেছন থেকে আমাকে ডাকল, 'শোনো, জাহিদ?'

আমি থমকে দাঁড়ালাম। পেছনে ফিরে দেখলাম রুবা বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। ও একটু এগিয়ে এলো আমার কাছে। এসে আমার চোখের দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে বলল, 'আরেকটু বসো। তোমার হাতে সময় না থাকতে পারে এটা মানি। তবুও তুমি যখন এলে আরেকটু বসো।'

আমি কোন কথা বললাম না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

রুবা আমার হাত ধরে টানতে টানতে বলল, 'এসো, এসো।'

আমি বললাম, 'কোথায়?'

'আমার ঘরে।'

'না। ঘরে যাব না। আমি এখন চলে যাব।'

'চলে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমার অনেক কথা বলার ছিল তোমাকে।'

'তোমার কথা তো শুনেছি।'

'না, তুমি শোনো নি। কোন কথাই বলা হয় নি তোমাকে। এখনো অনেক কথা বলা বাকি আছে। চলো, ঘরে চলো।'

'ঘরে গিয়ে কী হবে?'

'একটা বিশেষ কথা বলব তোমাকে। যা কাউকে বলি নি কোনদিন। আজ শুধু তোমাকেই তা বলব।'

কী এমন বিশেষ কথা রুবা আমাকে বলতে চায়?

জানি না।

আমি রুবার সঙ্গে হেঁটে ওর শোবার ঘরে এলাম। রুবা ও আমি খাটের ওপরে মুখোমুখি সবলাম। রুবার মুখটা এখন আমার কাছে বিষণ্ণ, উদাস মনে হল।

রুবা বলল, 'কী খাবে বলো, কাজের মেয়েটাকে বলি, একটু কফি করুক?'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে।'

রুবা বসা থেকে উঠে গিয়ে কাজের মেয়েকে কফির কথা বলে এসে ওর শোকেসের ড্রয়ার থেকে একটা ছবি বের করে এনে আমাকে দেখিয়ে বলল, 'এহচ্ছে দেলোয়ার। আমার স্বামী।'

আমি খাটের একপাশে চুপ করে বসেছিলাম। ছবিটা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে রুবাকে বললাম, 'উনি এখন নেই, তাই না?'

রুবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বিষণ্ন, উদাস গলায় বলল, 'না, নেই। মরে গেছে। তবে কি জানো জাহিদ? ওর মরণ স্বাভাবিকভাবে হয় নি।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সে কী, তাহলে?'

রুবা একটু হাসল। ওর হাসিটাকেও বিষণ্ন, উদাস মনে হল।

রুবা হাসি থামিয়ে বলল, 'সবাই জানে ও হার্ট এ্যাটাক হয়ে মারা গেছে। পৃথিবীর সবাই জানে ও হার্ট এ্যাটাক হয়ে মারা গেছে। কেউই জানে না যে আমিই মেরে ফেলেছি ওকে।

'একি বলছ রুবা!'

আমি ভীষণ অবাক হলাম রুবার কথা শুনে।

রুবা বলল, 'তুমি কি অবাক হলে আমার কথা শোনে?'

আমি কোন কথা বললাম না।

রুবা ফের বলল, 'তুমি কি আমার কথা বিশ্বাস করছ, জাহিদ।'

আমি বোকার মত রুবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর ধীর গলায় আমি বললাম, 'কোন্ কথা?'

'এই যে আমি বললাম, দিলোয়ারকে আমি মেরে ফেলেছি।'

'না। আমি তা বিশ্বাস করছি না।'

'কেন?'

'বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'বিশ্বাস করতে পারছ না কেন?'

'তুমি এ কাজ করতেই পার না। কখনোই না।'

রুবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'শোনো, দিলোয়ারকে আমি কেন মেরে ফেলেছি সেই গল্পটা এখন তোমাকে বলছি।'

আমি রুবার মুখের দিকে তাকালাম।

রুবা ভাবলেশহীন গলায় বলতে লাগল, 'আমার স্বামী দু'টি জিনিসের প্রতি আসক্ত ছিল। ড্রাগ ও নারী। অবশ্য ব্যাপারটা বিয়ের পরপরই আমি বুঝতে পারিনি। যখন বুঝতে পেরেছি তখন পুষ্পিতা আমার গর্ভে। সেটা বিয়ের প্রায় চার বছর পরে। একদিন রাতে ড্রাগ গ্রহণ করে বাসায় ফিরল ও। আমি ভীষণ হতবাক হয়ে গেলাম। আমার স্বামী ড্রাগ নেয়! এটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারলাম না। আমি ভীষণ ক্ষেপে গেলাম ওর প্রতি। ও তখন আচকা আমাকে বলে বসল, 'তোর বাপের পয়সায় এসব করছি, বল!'

আমি তখন চুপ করে রইলাম। চুপ করে থাকা ছাড়া তখন আমার কিছুই করার ছিল না। ও টাকা-পয়সা কম রোজগার করেনি। কিন্তু ওসব ছাইপাশ গিলে গিলে সব উড়িয়ে দিতে লাগল। প্রায় প্রতি রাতেই নেশা করে বাসায় ফিরত। আমি কিছু বলতে গেলেই আমাকে মারতে চাইত। হঠাৎ একদিন ও জেনে গেল যে বিয়ের আগে তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল। এটা জানার পরে ও আমাকে মোটেও সহ্য করতে পারত না। আমাকে মারধর করতে শুরু করল। আমি মুখ বুজে সব সহ্য করত লাগলাম। তখন প্রতিবাদ করার মতো ইচ্ছে ও অনুভূতি আমার ছিল না। দিনে দিনে ওর আচরণ চরমে উঠে গেল। আমার চোখের সামনেই কাজের মেয়েকে নিয়ে ফস্টি-নস্টি করতো । আমি কিছু বললেই আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ত আমাকে মারার জন্য। আমি ওকে আর কিছু বলতে চাইলাম না। যা খুশি করুক ও। তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি ওর প্রতি কোন রকম অনুরাগ অনুভব করা থেকে বিরত রইলাম। ভুলে গেলাম ও আমার স্বামী। কিন্তু আমি ডিভোর্স দিলাম না। একই বাড়িতে দু'জনে আলাদা ঘরে থাকা শুরু করলাম। তবুও রেহাই পেলাম না। ডিভোর্স দিতে চাইলাম। কিন্তু এতে কী হবে? ডিভোর্স মানে কী- তোমার সঙ্গে আমার মিলছে না, কিছুতেই মিলবে না। তাই দু'জন দুই পথে চলে যাওয়াই ভালো। অর্থ্যাৎ তোমার আমার সম্পর্কটা বাতিল করা যাক। কিন্তু ডিভোর্স পেতেও আইনের সম্মতির জন্য অনেক কিছু করতে হবে। হাত বাড়িয়ে চাইলেই সেটা পাওয়া যাবে না। জানো! আমার মেয়ে পুষ্পিতার জন্ম হয়েছিল কীভাবে? সেদিন আমার স্বামী সন্ধ্যে বেলায় ফিরে এলো বাসায়। নেশা করেনি। আমার তখন পেইন শুরু হয়েছে। ওকে বললাম হাসপাতালে নিয়ে যেতে আমাকে। ও বলল, 'আমার জরুরী একটা ফাংশনে আছে। আমি এখনই বেরুব।'

আমি বললাম, 'এর চেয়েও জরুরী?'

ও কিছু না বলে বেরিয়ে গেল। আমার ভীষণ অভিমান হল ওর প্রতি। আমার শরীরে যত জলকণা ছিল দু'চোখ বেয়ে অশ্রু হয়ে ঝরে পড়তে চাইল। আমি শত চেষ্টা করেও কান্না চেপে রাখতে পারলাম না। অভিমানী এক শিশুর মতো আমি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। নিঃশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হচ্ছিল আমার। ব্যথায় ভীষণ অস্থির হয়ে পড়লাম। কিছুতেই ব্যথাটা সহ্য করতে পারছিলাম না। বুঝতেই পারছিলাম, ও আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে না। এদিকে অভিমান করে বসে থেকে ব্যথা বেড়ে যাচ্ছিল দ্বিগুন। ওর ওপরে অভিমান করে বসে থাকলে চলবে না। বুঝতে পারলাম, তারের ওপর দিয়ে হাঁটতে হবে আমাকে। তাই আমি নিজেই একটা রিকশা নিয়ে হাসপাতালের দিকে ছুটলাম। ব্যথাটা আরো বেড়ে গেল। ওপর থেকে নিচে এলো নেমে ব্যথাটা। আমি দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করার চেষ্টা করলাম। হাসপাতালে পৌঁছাতে আধঘণ্টা সময় লেগে গেল। হাসপাতালের বেডে শুয়ে আমি প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। হঠাৎ অনুভব করলাম আমার শরীরের ভেতর থেকে আরেকটা শরীর বেরিয়ে এলো এ পৃথিবীতে। কিছুক্ষণ পরে একটা শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত চেতনায় অদ্ভুত এক আরাম বোধ ছড়িয়ে পড়ল। ভীষণ একটা সুখ অনুভব করলাম। এত সুখ আমি জীবনে খুব কমই পেয়েছি। আমি বিছানায় চোখ বন্ধ করে শুয়ে ছিলাম। নার্স আমার কানের কাছে প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'এই যে, শুনছেন।'

আমি চোখ মেলে তাকালাম।

নার্স স্মিথ হেসে বলল, 'আপনার মেয়ে হয়েছে, দারুণ সুন্দর!'

আমি দেখলাম আমার পাশে হাসপাতালের বিছানাকে উজ্জ্বল করে শুয়ে আছে আমার মেয়ে। পুতুলের মত মেয়ে আমার।

আমি ডিভোর্স দিলাম না বটে। তবে একই বাড়ির ছাদের তলে দু'জন মানুষ আলাদা বিছানায় ঘুমাতে শুরু করলাম। স্বামী-স্ত্রীর মিলিত জীবনকে যদি দাম্পত্য জীবন বলে তাহলে এটা কী ধরনের দাম্পত্য জীবন?

আমার স্বামী দিনে দিনে ভীষণ নীচ ও নিষ্ঠুর হয়ে পড়ল। মেয়ের প্রতি ওর কোন রকম ভালোবাসা ছিল না। নেশা করে প্রায় মাতাল হয়ে রাত-বিরেতে বাসায় ফিরতো। আমি ভেবেছিলাম, ও আমার প্রতি নির্দয় হলেও সন্তানের প্রতি সদয় হতে পারে। কিন্তু ও তা হলো না। রাত বারোটা কিংবা একটা বাজিয়ে নেশায় মাতাল হয়ে স্বামী বাসায় ফেরার অপেক্ষায় যে মেয়েরা রাত জেগে বসে থাকে আমি সেই মেয়েদের দলে নই। আমি আমার মেয়েকে নিয়ে নিজের আলাদা ঘরে শুয়ে ঘুমিয়ে থাকতাম। ও কখন বাসায় ফিরত, কখন খাবার খেত, কখন ঘুমাত আমি কোন খবরই রাখতাম না।

হঠাৎ একদিন আমার মনে হল, আমার স্বামী নেশা করে, মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করে, আশালীন ভাষায় আমাকে গালাগালি করে, আমাকে মেরেছেও। এসব ভেবে ভেবে প্রচণ্ড ক্ষোভ হল ওর প্রতি আমার। তাই ঠিক করলাম, আমাকে যা করার তা একাই করতে হবে। কারো উপড় নির্ভর করা আমার কপালে নেই। একটা কিছু করতেই হবে।

সেদিন ও বেশ রাত করে বাসায় ফিরল। আমি বসে বসে ওর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম ওর পায়ের শব্দ। ও সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে উপড়ে উঠে আসছে। একতলা থেকে দো'তলা, দো'তলা থেকে তিনতলা। প্রচন্ড নেশা করেছে। ঠিকমত পা ফেলে উপরে উঠে আসতে পারছিল না। বারবার টলে পড়ছিল। ও তিনতলা থেকে চারতলায়-আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানে উঠে এলো। আমি বুঝতে পারছিলাম, ওর শ্বাসে কুলোচ্ছিল না। হাঁপিয়ে উঠছিল। চারতলা পর্যন্ত উঠে এসে আসতে যেন একযুগ পেরিয়ে যাচ্ছিল। ও আমার কাছাকাছি এসে ঢলে পড়ে যাচ্ছিল প্রায়। আমি প্রচন্ড ক্ষোভ আর জেদে দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বেশ জোরে ওকে ধাক্কা দিলাম। ও শ্লথ গতিতে গড়াতে গড়াতে সিঁড়ির নিচে গিয়ে পড়ল। ধরে আসা গলায় তখন ও আমাকে ডাকল, 'একি করলে রুবা? আমাকে মেরো না, প্লিজ। প্লিজ রুবা আমাকে বাঁচাও, বাঁচাও আমাকে!'

আমি ওকে ধরলাম না। ও সিঁড়ির গোড়াতে পরে রইল। মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো। বন্ধ হয়ে এলো শ্বাস। ও হাঁ করে শ্বাস টানার চেষ্টা করল প্রাণপণে। কিন্তু পারল না। আমি এগিয়ে গেলাম ওর কাছে। ও আমাকে দেখে একটা হাত বাড়িয়ে দিল। তখন আমি কী করলাম জানো?'

আমি চুপ করে রইলাম।

রুবা একটু থামল। তারপর বলল, 'আমি ওর হাতটা ধরলাম না। ধীরে ধীরে ওর শরীরের রক্ত সঞ্চালন থেমে গেল। নিশ্চল, নিশ্চুপ হয়ে পড়ল ও। আমি আমার ঘরে এসে ওর মৃত্যু সংবাদ পাবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। পরে সবাই জানতে পারল ও হার্ট-এ্যাটাক হয়ে মারা গেছে।'

আমি বসা থেকে উঠে দাঁড়ালাম। নিচু গলায় বললাম, 'আসি।'

রুবা কিছু বলল না। আমি রুবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

মন কেমন করে ...

তখন গভীর রাত। ঘড়িতে দুটো বাজে।
আমি বারান্দায় বসে আছি নিরিবিলি। আমার চোখে প্রচন্ড ঘুম। কিন্তু আমি বিছানায় ঘুমোতে গেলাম না। ঘুমোতে ইচ্ছে হলো না। বারবার শুধু রুবার মুখটা মনে পড়ল। এতদিন পরে আজ রুবাকে যে দেখেছিলাম তা-ই মনের মাঝে ঘুরে ফিরে ভিড় করতে লাগল বারবার। অনেকদিন পরে আজ আবার আগের মত রুবার জন্য আমার মন কেমন যেন করতে লাগল। "আমার মন কেমন করে, কে জানে; কে জানে কাহার তরে...।"

আমি বারান্দা থেকে শোবার ঘরে ফিরে এলাম। মধ্য রাতের এই সময়টাতে বাড়ির কেউ জেগে নেই। ঘুমিয়ে আছে সবাই। আমি শুধু জেগে আছি। আমার বুকের ভেতর বেদনা, হাহাকার, হতাশা আর দীর্ঘশ্বাস। আমি রুবার কথা ভাবছি। মনে প্রাণে ভাবছি। ওর মুখটা মন থেকে সরিয়ে ফেলতে পারছি না কিছুতেই। ওর কথা ভেবে এক ধরনের ব্যথা অনুভব করছি আমি। "ভেবে ভেবে ব্যথা পাব, মনে হবে, পৃথিবীর পথে যদি থাকিতাম বেঁচে...।"

আমার মনে হল, রুবা ছাড়া এজীবন একেবারে স্থবির, নিশ্চল। জীবনে আমার কোন সুর নেই, ছন্দ নেই, গতি নেই। এমন কেন হল? কেন হল এমন? রুবা ছাড়া যে জীবনকে সুরহীন, ছন্দহীন, গতিহীন মনে হয়, সেই জীবন নিয়ে বেঁচে থাকতেও ইচ্ছে করে না। বেঁচে থেকে কী হবে? তার চেয়ে জীবন থেমে যাক, নিথর হয়ে যাক চিরতরে সে-ই ভালো। মরণ। হ্যাঁ, আত্মহননই পারে এ জীবনক থামিয়ে দিতে, নিথর করে দিতে। না, আমি গলায় দড়ি দেব না। বিষ ও করব না পান–

"স্লিপিং ট্যাবলেট খেয়ে অনায়াসে মরে যেতে পারি,
বক্ষে ঢোকানো যায় ঝকঝকে উজ্জ্বল তরবারি।
কপাল লক্ষ করে টানা যায় অব্যর্থ ট্রিগার,
ছুঁয়ে ফেলা যায় প্রাণবান বৈদ্যুতিক তার।
ছাদ থেকে লাফ দেয়া যায়
ধরা যায় ভোর বেলার রেলগাড়ি।
অজস্র অস্ত্র আছে-
যে কোনো একটি দিয়ে আত্মহত্যা করে যেতে পারি।"

এসবের যে কোন একটি উপায়ে সত্যিই আমি আমার জীবনকে থামিয়ে দিতে পারি। মধ্যরাতের এই নির্জনে সবাই ঘুমিয়ে আছে। বড় নিঝুম, নিস্তব্ধ

সময় এখন। আত্মহত্যা করার এখনই মোক্ষম সময়। আমি এখন ছাদে গিয়ে উঠব। তারপর "আমার মৃত্যুর জন্য কেউই দায়ী নয়" এ কথাটি একটি কাগজে লিখে রেখে চোখ বন্ধ করে একটা লাফ দেব ছাদ থেকে। ধপাস করে একটা শব্দ হবে শুধু। ব্যস, নিশ্চল হয়ে যাব চিরতরে।"তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু আর আমি জাগিব না, কোলাহল করি সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙ্গিব না... ।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আর, তার পরে?'

জাহিদ নিজের গল্প বলতে বলতে যেন ক্লান্তশ্রান্ত হয়ে পড়ল। সে ধরে আসা গলায় বলল, 'তারপরে আর কী? "তারপরে আমার নটেশাকটি মুড়োল। স্বপ্ন আমার ফুরোল... ।"

আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত সাড়ে তিনটে। বেশ রাত হল। জাহিদ একনাগাড়ে ওর জীবনের গল্প বলে চলছিল এতক্ষণ। আমি মন দিয়ে তা শুনছিলাম। জাহিদ এবার বসা থেকে উঠল। উঠতে উঠতে বলল, 'আমার জীবনের গল্পটা কী অদ্ভুত, তাই না?'

আমি তা স্বীকার করলাম।

জাহিদ দরজার দিকে হেঁটে নিজের রুমের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে একবার পেছনে ফিরে আমাকে বলল, 'বিদায়, শুভরাত্রি... ।'

আমি বিছানায় এসে শুয়ে ঘরের বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

এত রাত অবধি জেগেছিলাম বলে সকালে একটু দেরিতে ঘুম ভাঙ্গল। ঘুম ভাঙ্গতেই আমার বাসার গেটের সামনে কিছূ মানুষের চিৎকার, চেঁচামেচি আর হৈচৈ শুনলাম। কীসের এই চিৎকার, চেঁচামেচি আর হইচই তা দেখার জন্য গেটের কাছে এলাম। দেখলাম এ পাড়ার লোকজন ছাড়াও কিছু অচেনা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। অচেনা মানুষগুলোর মধ্য থেকে একজন আমাকে বলল, 'এই যে, স্যার, আপনার সঙ্গে কি জাহিদ থাকে?'

আমি কিছু না বুঝেই বললাম, 'হ্যাঁ থাকে। কেন, কী হয়েছে? আপনারা কারা?'

লোকটা বলল, 'আমরা কুসুমপুর থেকে এসেছি। জাহিদের গ্রামের বাড়ির মানুষ। আচ্ছা, জাহিদ আপনার সঙ্গে থাকে কতদিন?

আমি বললাম, 'দুই বছর প্রায়।'

লোকটা বলল, 'আশ্চর্য। ঠিক দুই বছর ধরে ও এখানে আছে।'

আমি লোকটার কথা কিছুই বুঝলাম না। জাহিদ দুই বছর ধরে আমার সঙ্গে এই ফ্ল্যাটে থাকে। কিন্তু ওরা জাহিদের কথা ওভাবে জানতে চাইছে কেন? যেন জাহিদ পলাতক আসামী? দুই বছর ধরে পালিয়ে আছে। ওরা কি ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছে?

আমি বললাম, 'আচ্ছা ভাই, ব্যাপারটা কী? একটু বুঝিয়ে বলুনতো আমাকে।'

অন্য একজন লোক আমাকে যা বলল তাতে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না। লোকটা আমাকে বলল, 'দুই বছর আগেই জাহিদ মারা গিয়েছিল। আমরা তাকে নিজ হাতে কবর দিয়েছি। হঠাৎ একদিন ঢাকায় একটি দোকানের সামনে ওকে দেখতে পেয়ে আমরা ফলো করে আসছি। প্রথমে ভেবেছি, এ জাহিদ নয়। জাহিদের মতো কেউ। কিন্তু আজ আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে আপনার সঙ্গে যে লোকটা থাকে সে-ই জাহিদ। দুই বছর আগেই যে মারা গিয়েছিল!'

আশ্চর্য! দুই বছর আগে যে লোকটা মারা গিয়েছে সে আমার সঙ্গে বসবাস করেছে! আমি একজন মৃত মানুষের সঙ্গে বসবাস করেছি এতদিন! তাই বুঝি জাহিদ রাতে বিড়ালের রূপধারণ করে ঘুমোয়! এ জন্যই ওর এত অলৌকিক ক্ষমতা!

আমি দৌড়ে জাহিদের রুমের দিকে ছুটলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে ওকে পেলাম না। তাপরপর আর কখনো, কোনদিন ওর সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। কোথাও আমি ওকে আর দেখিনি।

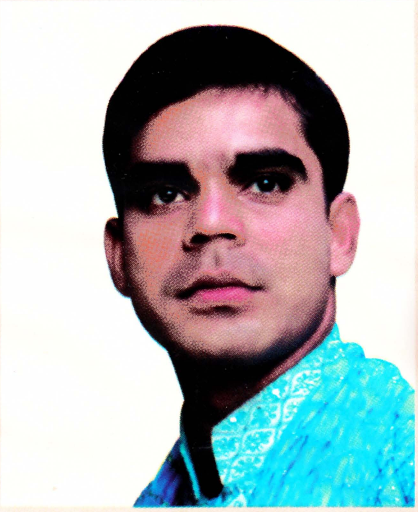

আবুল বাসারের জন্ম কুমিল্লা জেলার অনন্তপুর গ্রামে ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬ সালে। জন্ম থেকেই একটু অন্যরকমভাবে বেড়ে উঠেছেন। "মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা"-এ নীতিতে সমাসীন থেকে সেই সত্যিগুলো অকুণ্ঠভাবে সে মুখের ওপরে বলে দেয় আর দশটা ছেলে যা বলতে সংকোচ বোধ করে। এজন্য যাপিত জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁকে হতে হচ্ছে প্রতারিত, নিন্দিত এবং কখনো কখনো নন্দিত। তবু তিনি সত্যের পথে চলেছেন।। চলতে চলতে যে পথটুকু পেরিয়ে এসেছেন আদৌ তা নির্বিঘ্ন ছিল না। ছিল অনেক বাধা-বিপত্তি। তবু সৎ, ন্যায় ও নিজ আদর্শে সক্রিয় থেকে সব বাধা অতিক্রম করতে গিয়ে তিনি ভীষণ ক্লান্ত-শ্রান্ত, ত্যাক্ত-বিরক্ত হয়ে আশ্রয় নেন আবার সেই সত্যের গাছতলাতেই। কারণ তিনি মনে করেন, সত্যের সঙ্গে মিতালী করেই তাঁকে পাড়ি দিতে হবে বহু পথ। যে পথের দিকে চিরকাল মানুষ ছুটেছে, ছুটছে এবং ছুটবে।

শৈশব-কৈশোর থেকেই তিনি উড়নচণ্ডী আর বাউণ্ডুলের মতো দিগ্বিদিক ঘুরে বেড়িয়েছেন। কোথাও স্থির হতে না পেরে জীবনের অন্তর্জগতের স্বরূপ অম্বেষায় ভাষা, শব্দ আর বোধের মিশ্রণে স্বপ্ন-বাস্তবতার শিল্পসৌধ নির্মাণ করতে নেমে পড়েন। তখন পারিপার্শ্বিক সব কিছুই বস্তুময় হয়ে উঠতে দেখে সকল দুরন্তপনা আর বাউণ্ডুলেপনা ছেড়েছুড়ে জীবনকে উপভোগ করতে শুরু করেন, হয়ে উঠেন প্রবল জীবনবোধসম্পন্ন একজন সুবোধ মানুষ।

তিনি আকাশ ও পৃথিবী দেখেন জীবন ও প্রকৃতি নিয়ে লেখেন। এজন্য তাঁর লেখার ভাষাশৈলী, শব্দ প্রয়োগ ও বিষয় উপস্থাপন সনাতনের মধ্যেও স্বতন্ত্র।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ কার কাছে যাবো (ছোট গল্প, দূর্বা প্রকাশ)

ছুঁয়ে দিলাম তোমাকে (উপন্যাস, পার্ল পাবলিকেশন্স)

শুধু তোমার জন্য হে প্রিয়তমা (কবিতা, কলি প্রকাশনী)

রাফিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না (কিশোর উপন্যাস, শিখা)

High Quality Aohor Arsalan Scan
scan with canon
Aohor Arsalan
ALL OUR BOOKS ARE HQ IN QUALITY
LATEST, RARE & TOP COLLECTION
Visit Us Now
WWW.BANGLAPDF.NET